সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ

[২০০৭]

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ

[২০০৭]

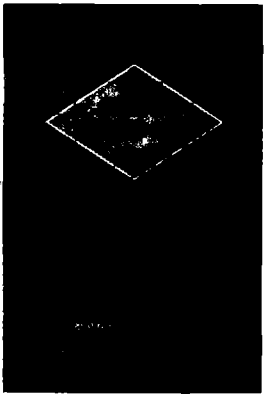

সম্পাদনায়

মোশাররফ হোসেন খান

সেমিনার বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

www.bjilibrary.com

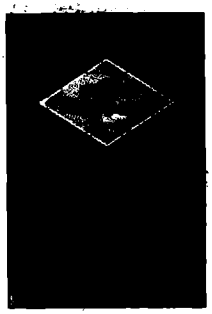

সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ
[২০০৭]
সম্পাদনায়
মোশাররফ হোসেন খান
সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড [৪র্থ তলা]
ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৮৬২৭০৮৬-৭
ই-মেইল : bic @ accesstel.net
প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০০৭
গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
প্রচ্ছদ
গোলাম মাওলা
মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭
বিনিময়
একশত বিশ টাকা

www.bjilibrary.com

সূ চী ক্র ম

সে মি না র প্র ব ন্ধ

ইউরো-আমেরিকান সমাজের অন্ধকার দিক
অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান ॥ ৫
বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতা
ড. মাহফুজ পারভেজ ॥ ১৪
গ্রামীণ ব্যাংক : একটি পর্যালোচনা
মুহাম্মদ নূরুল আমিন ॥ ৩২
পশ্চিমা জগতের ইসলামফোবিয়া
প্রফেসর ড.. এম. উমার আলী ॥ ৫৪
হান্টিংটন ডকট্রিন : একটি পর্যালোচনা
মুহাম্মদ নূরুল আমিন ॥ ৮৪
দুর্নীতি : এর নানারূপ, কারণ ও প্রতিকার
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ॥ ১০৮
পুঁজিবাদী শোষণের নানা কৌশল
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ॥ ১১৫

প রি শি ষ্ট

সেমিনার-প্রতিবেদন
মোশারফ হোসেন খান ॥ ১৩৮

www.bjilibrary.com

ইউরো-আমেরিকান সমাজের অন্ধকার দিক

অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান

■

ইউরো-আমেরিকান সমাজের কথা উঠলেই কল্পনার দিকচক্রবালে ভেসে ওঠে আকাশচুম্বী সব অট্টালিকার সারি, প্রশস্ত রাজপথে নয়া মডেলের নানা রঙের গাড়ি, আলো ঝলমল বার-বিপণী বিতান আর যুগলবন্দী অসংখ্য নর-নারীর উচ্ছ্বাসের বান। বিশ্বসভ্যতায় তাদের অবদানের প্রসঙ্গ এলে কল্পনার দৃশ্যপট ভরে যায় তীব্রবেগে ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া নভোযানের উদ্‌গীরিত বিপুল ধোঁয়ায়। তারপর দৃশ্যান্তর– অত্যাধুনিক যানবাহনের সচ্ছন্দ বিচরণ। আরো কত কার্যকলাপ, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অত্যাধুনিক তাদের? জীবনকে সাজানোর জন্য আর কি চাই? এরকম সমাজ-ই কি সুখের স্বর্গ বা আনন্দের নন্দন-কানন নয়? এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না– এমন মানুষ আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে নেহায়েত কম নেই। তবে এমন মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য যারা পশ্চিমা সভ্যতার সংকট সম্পর্কে সচেতন। চোখ ধাঁধানো মোড়কটি খুলে এই সভ্যতার ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে আঁতকে ওঠার মত বীভৎস চিত্র সেখানে অগণিত। দেখতে দেখতে মনে হবে, আমাদের আপন সমাব-সভ্যতা অনেক অনেক উন্নত, নিরাপদ, শান্তিময়। অন্তর করুণাসিক্ত হবে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অতি উন্নত এইসব জাতির জন্য, আর তাদের জন্য যারা আমাদের সমাজটিকে ভেঙ্গেচুরে পশ্চিমাদের মত করে গড়তে বদ্ধপরিকর।

www.bjilibrary.com

অপরাধের স্বর্গরাজ্য

পশ্চিমা সমাজকে রূপকথার মায়াবিনীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তার রূপের জৌলুস আছে, আছে তীব্র আকর্ষণ, কিন্তু অন্তরে অমৃত নেই; আছে গরল। তার সৌন্দর্যে সুধা নেই, আছে সর্বনাশা ক্ষুধা। তার ক্ষমতা অনেক, কিন্তু একটু সুখ, একটু শান্তি, একটু নিরাপত্তা দিতে কতই না অক্ষম সে। মার্কিন মনীষী জেমস কোলম্যান তাঁর Abnormal Psychology and Modern Life গ্রন্থে বলেন : "Official figures compiled by the Federal Bureau of Investigation indicate that the crime rate is higher in the United State than in most other countries, and that the rate is continuing to rise." অপরাধের হার যুক্তরাষ্ট্রে কতটা উচ্চ আর তা কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আসুন তা এক পলক দেখে নেই। কোলম্যানের দেওয়া তথ্য অনুসারে ১৯৭৪ সালে সে দেশে ১০ মিলিয়ন (১ কোটি)-এর অধিক অপরাধের ঘটনা পুলিশের নথিভুক্ত হয়। ১৯৯৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩.২ মিলিয়ন (সূত্র : Adler, Mueller, Laufer. Criminology. p-38. McGraw-Hill)। ১৯৭৪ সালে প্রতি তিন সেকেণ্ডে একটি গুরুতর অপরাধ (violent crime) এবং ৩০ সেকেন্ডে একটি মারাত্মক অপরাধ (serious crime) সংঘটিত হয়েছিল। কুড়ি বছর পর ১৯৯৪ সালে গুরুতর অপরাধের হার ছিল দুই সেকেন্ডে একটি আর মারাত্মক অপরাধ ঘটে ১৬ সেকেন্ডে একটি হারে। এটি কিন্তু শুধু সেই হিসাব যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় রিপোর্ট করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা এর দ্বিগুণেরও বেশি। ভয়-ভীতি বা হয়রানি এড়ানোর জন্য কিংবা ক্ষয়-ক্ষতি কম হওয়ায় অনেক ঘটনা পুলিশে রিপোর্ট করা হয় না। এমন অসংখ্য ঘটনার তথ্য বেরিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ গবেষণা সংস্থা NCVS (National Crime Victimization Survey) থেকে। ১৯৯৭ সালে যেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় রিপোর্ট করা হয়েছে ১৩.২ মিলিয়ন অপরাধ, সেখানে, NCVS এর জরিপে বেরিয়ে এসেছে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন সমাজে অর্থ-সম্পদ, মান-ইজ্জত এমনকি জীবন কত নিরাপত্তাহীন।

ধন-সম্পদ নিরাপদ নয়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পাশ্চাত্যের হাতে সম্পদের পাহাড় এনে দিলেও দিতে পারেনি তার নিরাপত্তা। অল্প আয়াসেই হাতে এসে যায় অনেক সম্পদ, কিন্তু অনেক আয়াসেও অনেক সময় তা রক্ষা করা যায় না। অবলীলায় তা চলে যায় চোর-ডাকাতের হাতে। ভাবতেই অবাক লাগে, সম্পদের বন্যায় যে সমাজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সেখানেও চুরি-ডাকাতি হয়! যে সমাজে ছাত্র-ছাত্রীরা সরকার থেকে শিক্ষা-ব্যয়ের পাশাপাশি হাত-খরচ পায়, বেকাররা পায় মোটা অঙ্কের বেকার-ভাতা, এমনকি বেকার পিতা-মাতার সন্তানদের ব্যয়ও সরকার বহন করে, সেই সমাজেও চুরি-ডাকাতি হয়! শুধু হয়-ই না, অবিশ্বাস্য রকম বেশি হয়। NCVS থেকে জানা যায় ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের চুরি (Larceny, burglary, personal theft, motor vehicle theft) সংঘটিত হয়েছিল ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৩ হাজারটি অর্থাৎ প্রতি ১.৩৬ সেকেন্ডে ১টি হারে (সূত্র : Schmalleger & Smykla. Corrections in the 21st Century. p-12. Glencoe McGraw-Hill)।

www.bjilibrary.com

ধন-সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই পরিলক্ষিত হয় না, ইউরোপের দেশগুলিও এক্ষেত্রে তেমন পিছিয়ে নেই। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মোটর গাড়ী চুরির একটি তথ্য আমরা পেয়েছি International Crime Victim Survey 2003 থেকে। এই জরিপে বলা হয়েছে ইংল্যান্ড, ইটালি, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে মোটর গাড়ি চুরির হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি (সূত্র : Richard T. Schaefer. Sociology, 9th ed. p-192. McGraw-Hill)। যে দেশে অপেক্ষাকৃত কম গাড়ি চুরি হয় সেই মার্কিন মুল্লুকেই ১৯৯৮ সালে ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার গাড়ি চুরি হয় অর্থাৎ গড়ে প্রতি মিনিটে ২টিরও বেশি গাড়ি চুরি হয়। (সূত্র : Corrections in the 21th Century. p-12)

ছিনতাই-রাহাজানিও পশ্চিমা সমাজে নেহায়েত কম নয়। Criminology গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্যমতে ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ গড়ে প্রতি মিনিটে সে দেশে ২টি ডাকাতি হয়ে থাকে। ইউরোপের সবচেয়ে উন্নত দেশ ইংল্যান্ডের একটি তথ্য আমাদের হাতে আছে। The Daily Telegraph এ প্রকাশিত তথ্যমতে ১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ডে ডাকাতির ঘটনা ১৯৭% বেশি ঘটেছিল। (সূত্র : Mahjubah, March-1987)

মান-ইজ্জত নিরাপদ নয়

নিরাপত্তাহীনতার এই করুণ চিত্র শুধু ধন-সম্পদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, পশ্চিমা বিশ্বে মান-ইজ্জতও নিত্য হুমকির মুখে পড়ে থাকে। কি নারী, কি পুরুষ, কি শিশু, কি বৃদ্ধ– কারো মান-ইজ্জতই আজ নিরাপদ নয়। যে কেউ যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারে, লাঞ্ছিত হতে পারে। ১৯৯৮ সালে ৫২ লক্ষ ২৪ হাজার সাধারণ হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়। একই বছর সাংঘাতিক হামলার ঘটনা ১৬ লক্ষ ৭৪ হাজার। (সূত্র : Criminology, p-298) আরো দুঃখজনক ব্যাপার হল সে সমাজে স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের সাথে সম্মানজনক আচরণ করে না। গড়ে প্রতি ছয় দম্পতির মধ্যে এক দম্পতি জরিপের বছরটিতে হানাহানির ঘটনা ঘটিয়েছিল। এসব ঘটনার মধ্যে ৪০% ছিল মারাত্মক ধরনের। (সূত্র : Criminology. p-299) এটি কিন্তু খুব যথার্থ চিত্র নয়। নানা কারণে পারিবারিক মারপিটের অতি অল্প ঘটনাই পুলিম রিপোর্ট করা হয়। Criminology গ্রন্থে বলা হচ্ছে :

"Researchers agree that assaultive behavior within the family is a highly underreproted crime." (p-300)

অর্থাৎ– "গবেষকগণ একমত যে, পরিবারের মধ্যে আক্রমণাত্মক আচরণ এমন অপরাধ যার রিপোর্ট করা হয় অত্যন্ত কম।"

কলম্বিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ ১০টি দেশে ব্যাপক জরিপ পরিচালনা করে দেখা গেছে, প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন ঘনিষ্ঠ কোন পুরুষের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। (সূত্র : Social Problems. Annual Edtion-02/03. p-92 McGraw Hill)

অবাধ যৌনতা : পশ্চিমা সমাজের অবাধ ও বিচিত্র যৌনজীবনের কথা বিবেচনায় রাখলে

www.bjilibrary.com

সেখানকার যৌন-নির্যাতনের করুণ চিত্র আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। সে সমাজে যৌনতা একেবারেই বাধা-বন্ধনহীন। যে কোন নারী-পুরুষ যে কোন সময় চাইলেই মিলিত হতে পারে। এতে লোক-লজ্জার ভয় নেই, রাষ্ট্রের কোন বাধা-নিষেধ নেই। এমন কোন লোক খুঁজে পাওয়া রীতিমত দুঃসাধ্য যার বিবাহপূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা নেই। ত্রিশ বছরেরও বেশি আগে ১৯৭৪ সালে হান্ট সাহেব এক জরিপ চালিয়ে দেখেন ৯৫% পুরুষ ও ৮১% নারী বিয়ের আগেই যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। (Everett D. Dyre. Courtship, Marriage and Family : American Style. p-84. The Dorsey Press.) যৌনজীবন এতটাই বন্ধনহীন যে, সমলিঙ্গের মধ্যে দৈহিক সম্পর্কও সে সমাজে স্বীকৃত। ২০০০ সালের আদমশুমারি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র সমকামী (homozexual) লোকের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি। (সূত্র : Sociology. p-342) এখানেই শেষ নয়, সমলিঙ্গের মধ্যে বিবাহও পাশ্চাত্যের অনেক দেশে আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়াও সে দেশে রয়েছে পাঁচ লক্ষের বেশি পেশাদার পতিতা ও সমসংখ্যক খণ্ডকালীন পতিতা। (সূত্র : James C. Coleman. Abnormal Psychology and Modern Life. 5th ed. p-586) যৌনতা পশ্চিমা বিশ্বকে এতটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক, উচিত-অনুচিতের পার্থক্য পর্যন্ত ঘুচে গেছে। নিতান্ত ইতর প্রাণীর মত রক্তসম্পর্কের অতি আপনজনের সাথে দৈহিক সম্পর্কও আজ বিরল কোন ঘটনা নয়। এ সম্পর্কে এরিক গুডি বলেন–

"Brother-sister incest appears to be extremely common; it made up half of all the cases of incest and 94 percent of all incest that took place within the nuclear family." (Deviant Behavior, p-223)

অর্থাৎ "ভাই-বোনের মধ্যকার যৌন সম্পর্ক বোধহয় অতি সাধারণ ব্যাপার; রক্ত সম্পর্কের অতি ঘনিষ্ঠজনদের সাথে যৌন সম্পর্কের যত ঘটনা ঘটে এটি (ভাই-বোনের অবৈধ সম্পর্ক) তার অর্ধাংশ এবং ক্ষুদ্র পরিবারগুলোতে এ ধরনের ঘটনা যত ঘটে তার ৯৪%।"

যৌন নিপীড়ন : এত ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা দেবার পরও যখন প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটে, তখন বিস্ময় আর করুণা আমাদের অন্তরকে অভিভূত না করে পারে না। NCVS এর তথ্যমতে ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলপূর্বক যৌননিপীড়ন (ধর্ষণ নয় এরূপ) এর ঘটনা ঘটে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার। আর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় ২ লক্ষ (অর্থাৎ গড়ে প্রায় আড়াই মিনিটে একটি) (সূত্র : Encarth Encyclopaedia)। উত্তর আমেরিকার আরেকটি দেশ কানাডা। সেখানেও বিপুল সংখ্যক যৌন অপরাধ সংঘটিত হয়। সে দেশে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ৫১% নারী ধর্ষিতা হয়েছে অথবা তাদেরকে ধর্ষণের জন্য আক্রমণ করা হয়েছে। কানাডার টরন্টোকে উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ শহর মনে করা হয়। এক জরিপে দেখা গেছে সে শহরের শতকরা ৯৮ জন মহিলা কোন না কোনভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। (সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১/৭/৯৩ইং) লন্ডনের The Guardian পত্রিকার মতে ইংল্যান্ডের নারীদের ধর্ষিতা হবার সম্ভাবনা প্রতি পাঁচ জনে একজন। (সূত্র : Mahjubah, March-1987)

www.bjilibrary.com

কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন : কর্মক্ষেত্রেও নারীরা সহকর্মীদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনার শিকার হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে Liz Kelly বলেন :

"Sexual harassment is widespread in work contexts in which women have dealings with men for example, bar work, canteen work, childcare, cleaning, civil service, community work, hospital work, library work, shop work, social work, teaching and transport work." (Hester, Kelly, Radford. Women, Violence and Male-Power. p-25. Open University Press, USA.)।

অর্থাৎ– "যেসব কর্মে নারীদেরকে পুরুষের সাথে লেন দেন করতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন ব্যাপক, উদাহরণস্বরূপ বারের কাজ, ক্যানটিনের কাজ, শিশুদের দেখাশোনা, ধোঁয়ামোছার কাজ, সরকারি চাকরী, জনসেবার কাজ, হাসপাতালের কাজ, পাঠাগারের কাজ, দোকানের কাজ, সমাজকর্ম, শিক্ষকতা ও পরিবহণের কাজ।"

যৌন নিপীড়নের ওপর জরিপ চালিয়ে Stanko বলেন যে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করেন এমন নারীদের প্রতি দুই জনের একজন তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। বাকি ৫০% এর কি এরূপ অভিজ্ঞতা নেই? আসলে এই অর্ধাংশ যৌন হয়রানিকে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখেন। তারা এহেন আচরণকে পুরুষের তোষামোদ বা চাটুকারিতা ভেবে সয়ে যান। (সূত্র : Women, Violence and Male-Power. p-57)

শিক্ষাঙ্গনে যৌন নিপীড়ন : যৌন নিপীড়নের ঘটনা শিক্ষাঙ্গনেও ব্যাপক। পাশ্চাত্যের স্কুল-কলেজে এ ধরনের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। Encarta Encyclopaedia নামক বিশ্বকোষে বলা হচ্ছে,

"Complaints of sexual harassment occurring at schools and Colleges have become more numerous."

অর্থাৎ– "বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সংঘটিত যৌন হয়রানির অভিযোগও সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।"

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ২৩% থেকে ৪৪.৮% ছাত্রী ছেলে বন্ধুদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে (সূত্র : Ammerman & Hersen. Assessment of Family Violence. 2nd ed. p-212. John Wiley & Sons.)।

শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন : আমরা রীতিমত মর্মাহত হই যখন দেখি শিশুরাও যৌন নিপীড়ন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। শিশুদের প্রতি এই জঘন্যতম আচরণের ঘটনা কিন্তু মোটেই উপেক্ষা করার মত নয়। বরং প্রতিনিয়ত এ ধরনের অপরাদ সে সমাজে সংঘটিত হয়ে থাকে। এক জরিপে দেখা গেছে যত যৌন নিপীড়নের ঘটনা পুলিশে রিপোর্ট করা হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ ঘটে ১২ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ওপর। (সূত্র : Criminolgy. p-39) কানাডার অবস্থাও শোচনীয়। সে দেশের ৫৪% নারী বলেছে তারা ১৬ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। (সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১/৭/৯৩) ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক এক জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। এতে

www.bjilibrary.com

বলা হয়, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বার্বাডোস ও নেদারল্যান্ডের নারীদের প্রতি তিনজনের একজন শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। (সূত্র : Social Problems. p-92) ইংল্যান্ডের Royal Society for the Protecting and Care of Children (RSPCC) শিশু নির্যাতনের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, সে দেশে ১৯৮৩ এর তুলনায় ১৯৯৬ সালে শিশু ধর্ষণ ৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে। (সূত্র : Mahjubah, March-1987)

প্রাণের নিরাপত্তা নেই

পশ্চিমা বিশ্বে মানুষের জীবন যে কতটা নিরাপত্তাহীন তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। প্রতি বছর সহিংসতায় ঝরে যায় হাজার হাজার প্রাণ। ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ হাজার ২ শ ৯টি নরহত্যার ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ২টি প্রাণ ঝরে যায় ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে। অন্যান্য অপরাধের মত এক্ষেত্রেও ইউরোপ পিছিয়ে নেই। কেবল মস্কো শহরে প্রতি বছর ১০০০ এর বেশি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। (সূত্র : Sociology P. -192) ঘাতকের কবল থেকে শিশু-কিশোরও নিরাপদ নয়। ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬০ জন কিশোর নিহত হয়। (সূত্র : Criminology. p-296) কি ঘরে, কি বাইরে, কি স্কুলে, কি অফিসে– কোথাও কেউ আজ নিরাপদ নয়। ঘরে পিতা-মাতার হাতে সন্তান হত্যা, পথে সন্ত্রাসীদের বুলেট, স্কুলে সহপাঠীর মরণ আঘাত, কর্মস্থলে সহকর্মীর সহিংস আক্রমণ– সর্বত্র আতঙ্ক আর বিভীষিকা।

পারিবারিক হত্যাকাণ্ড : সব রকম সহিংসতার মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক হল পারিবারিক হানাহানি। সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্যে এ ধরনের ঘটনা অস্বাভাবিক রকম বেশি। Criminology গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর যত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তার ১১% হল শিশু সন্তান হত্যা (p-292)। ৪ বছরের কম বয়স্ক যত শিশু প্রতি বছর পড়ে গিয়ে, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, গলায় খাবার আটকে এবং গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় তার চেয়ে বেশি শিশু মারা যায় দুর্ব্যবহার ও অবহেলায়। (Encarta Encyclopaedia)

নিরাপত্তাহীন শিক্ষাঙ্গন : ইউরোপ-আমেরিকার সমাজে শিক্ষাঙ্গনেও ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে থাকে। এমনকি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ও আজ সন্ত্রাস কবলিত। ১৯৯৯ সালে টমাস হ্যামিলটন নামের এক কিশোর স্কটল্যান্ডের ডানব্লেনের একটি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে গুলি করতে শুরু করে। এতে কিন্ডারগার্টেনের ১৬টি শিশু মারা যায়, আহত হয় ১২ জন। এটি ইউরোপের সবচেয়ে সভ্য দেশ ইংল্যান্ডের চিত্র। আসুন আমেরিকার দিকে দৃষ্টি দেই। ১৯৯৮ সালে বড় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে আরকানসাসের জোনসবরো মিড্‌ল্ স্কুলে। শিক্ষাঙ্গনে একের পর এক পাইকারি হত্যার ঘটনায় দেশের আর সব স্কুলের মত এখানেও আতঙ্ক বিরাজ করছিল: সেই সাথে ছিল সতর্কমূলক ব্যবস্থা। শিশু-কিশোরদের বেশ কিছু দিন ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, গোলাগুলির সতর্ক-সংকেত বাজার সাথে সাথে তারা যেন শ্রেণীকক্ষ থেকে বেরিয়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছিল দুই

www.bjilibrary.com

কিশোর খুনী। ১১ বছর বয়স্ক এন্ড্রু গোল্ডেন ও তার ১৩ বছর বয়স্ক সহযোগী স্কুলের এলার্ম বেল বাজিয়ে দেয়। শিশুরা ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মাঠে। সাথে সাথে দুই বালক শুরু করে গুলিবর্ষণ। ছাত্র-শিক্ষক মিলে ১৫ জন লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। এদের মধ্যে ১ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্র মারা যায়। এই ঘটনার পরের বছর ১৯৯৯ এগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাববার কোন সুযোগ নেই। একটি সরকারি জরিপে দেখা গেছে, ওয়াশিংটন শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে ২২% ছাত্রের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। (সূত্র : দৈনিক ইনকিলাব, ৩০/৮/১৪০০ বাং) ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজার জন বালককে অস্ত্র ও বোমা সঙ্গে আনার অপরাধে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। (সূত্র : সাপ্তাহিক রোববার, ১৭/৫/৯৮ইং) Teen Trends গ্রন্থে বলা হয়–

"It is clear that violence at school, whether witnessed or experienced personally, is a fairly common occurance." (সূত্র : Bibby & Posterski, Teen Trends. p-87-. Stoddart.)

অর্থাৎ- "এটি পরিষ্কার যে, বিদ্যালয়ে সহিংসতা বেশ সাধারণ ঘটনা, তা চাক্ষুষ প্রমাণ হোক আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হোক।"

নিরাপত্তাহীন কর্মক্ষেত্র : ইতিপূর্বে কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে অফিস-আদালতে হানাহানির তথ্য উল্লেখ করা হচ্ছে। ১৯৯১ সালে এক বেকার যুবক তার পিকআপ ভ্যানকে টেক্সাসের একটি ক্যাফের মধ্যে চালিয়ে দেয় ও পিস্তল দিয়ে গুলি করতে থাকে। এই ঘটনায় ২২ জন মারা যায়। একই বছর জেমস হিউবার্টি নামক এক ব্যক্তি ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যাকডোনাল্ড-এ ঢুকে ২০ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ১৯৯৯ সালে মার্ক ও বার্টন নামক ব্যবসায়ী স্টক মার্কেটে লোকসান করে বাকহেড জেলায় তার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সেখানে ১৩ জনকে হত্যা করার পর নিজে আত্মহত্যা করে। (সূত্র : Criminology, p-293-294) এসব কিন্তু মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ এই পাঁচ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতি বছর গড়ে ১০০০ এর বেশি হত্যাকাণ্ড বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঘটে থাকে। (সূত্র : Criminology, p-294) এসব ঘটনার সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি নিরপরাধ, আর ঘাতকও জানে না সে কেন তাকে হত্যা করল।

শঙ্কা ও আতঙ্কের রাজত্ব

এতক্ষণের আলোচনায় আশা করি এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সবচেয়ে সভ্য সমাজ বলে যাদেরকে মনে করা হয়, তাদের প্রকৃত অবস্থা কত করুণ। এসব দেশের নাগরিকদের সময় কাটে সার্বক্ষনিক শঙ্কা আর আতঙ্কের মধ্যে। এ সম্পর্কে Criminology গ্রন্থে বলা হচ্ছে–

"To millions of Americnas few things are more pervasive, more frightening, more real today than violent crime and the fear of being assaulted, mugged, robbed, or raped. The fear of being victimized by criminal attack has touched

www.bjilibrary.com

us all in some way... Residents of many areas will not go out on the street at nigth. Others have added bars and extra locks to windows and doors in their homes... In some areas local citizens patrol the streets at night to attain the safety they feel has not been provided." (সূত্র : Criminology, p-287)

অর্থাৎ– "লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের কাছে আজ মারাত্মক অপরাধ এবং হামলা, ছিনতাই, ডাকাতি বা ধর্ষণের শিকার হবার যে ভয়, তার তুলনায় খুব কম জিনিসই বেশি ব্যাপক, ভীতিকর ও বাস্তব। অপরাধীদের আক্রমণের শিকার হবার ভয় আমাদের সকলকেই কোন না কোনভাবে স্পর্শ করেছে।... অনেক এলাকার অধিবাসীরা রাতে পথে নামে না। অন্যেরা স্থানীয় বাসিন্দারা পথে পাহারা বসায় সেই নিরাপত্তা লাভের আশায় যে নিরাপত্তা তাদেরকে দেয়া হয়নি বলে তারা অনুভব করে।"

লস এঞ্জেল্‌স্ এর পৌর কমিশনার রিটা ওয়াল্টার্স এর কাতরোক্তি থেকে তাদের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা আঁচ করা যায় : "ভয় তাড়ানোর জন্য পাঁচিল আর কতটা উঁচু করা যায় বলুন। তারও তো একটা সীমা আছে" (সূত্র : সাপ্তাহিক বোরবার, ২৯/৮/৯৩ইং)।

শেষ কথা

পশ্চিমা বিশ্বের বিপুল বিত্ত ও বিজ্ঞানের জ্ঞান তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই বিবেচনায় তাদেরকে নিতান্ত দুর্ভাগা না বলে উপায় নেই। কিন্তু তাদের চেয়েও বড় দুর্ভাগা হলাম আমরা, যারা তাদের অন্ধ অনুকরণে বদ্ধপরিকর, যারা মিথ্যে স্বর্গের তালাশে আপন সোনালী সমাজের কবর নিজ হাতে খনন করি। আমাদের সমাজ এমনকি অবক্ষয়ের এই নষ্ট সময়েও পশ্চিমা বিশ্বের যে কোন দেশের চেয়ে বেশি নিরাপদ ও শান্তিময়। আর আদর্শ ইসলামী সমাজ যদি বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়,ত তবে তা-ই দিতে পারে সকল প্রকার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এটি কোন অলীক কল্পনা, নয়। মহানবী (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে তো বটেই নানা যুগে নানা দেশে ঈমানদার শাসকদের শাসনামলেও শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ উপহার দিয়েছে আমাদের কালজয়ী আদর্শ ইসলাম। এমনকি জড়বাদী-ভোগবাদী দর্শনের বিজয় নিশান যখন বিশ্বব্যাপী উড়ছে, তখনো পৃথিবীতে এমন মুসলিম সমাজ আছে যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয় না বললেই চলে। এটি কোন অত্যুক্তি নয়। সৌদি আরবে দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন এমন একজন মার্কিন ডাক্তার স্যেমুর গ্রে সাক্ষ্য দিচ্ছেন :

"...মূল্যবান দ্রব্যে পরিপূর্ণ দোকানের দিকে চেয়ে দেখলাম, পূর্ণ এক ঘন্টা যার কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তা-ঘাটে দিন বা রাত সবসময়েই নিরাপত্তা বিরাজ করে যেমন বাড়ি-ঘরে নিরাপত্তা আছে। এরা এমন একটা সমাজে বাস করে যেখানে অতি অল্পই অপরাধ ঘটে থাকে এবং অপরাধ যারা করে তারা সাধারণত বাইরের লোক।" (সূত্র : ড. স্যেমুর গ্রে, বিইয়ন্ড দ্য ভেইল, অনুঃ সা'দ উল্লাহ্, পৃ-১৬৩)

মসজিদের মিনার থেকে যখন আযান-ধ্বনি ভেসে আসে, তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে মানুষ ছুটে যায় ছালাতে। এ ঘটনা ড. গ্রে-কে বিস্মিত করে। তিনি বলেন–

www.bjilibrary.com

"এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বোধ হল, কেমন করে মূল্যবান দ্রব্যাদি খোলা রেখে ব্যবসায়ীগণ নামাযের জন্য সময় দেয়। কেউ ভাবে না তার কোন দ্রব্য-বস্তু খোয়া যাবে, চুরি-চামারি ঘটবে। কারণ, চুরি করলে যে কবজি হারাতে হবে, তা সকলেই জানে। আমার এ দৃশ্য দেখে মনে হল আমরা কোন পরীর রাজ্যে বাস করছি, যেখানে মানুষ এত সৎ হতে পারে।" (সূত্র : বিইয়ন্ড দ্যা ভেইল, পৃ-১৫৮)

ড. গ্রে মুসলিম সমাজের সেই নমুনা দেখে সবিস্ময়ে তাকে 'পরীর রাজ্য' বলেছেন, যে সমাজে ইসলাম আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামের মূল কর্মসূচী তথা নৈতিকতায় সংস্কার সৌদি আরবে অনেকটা অবহেলিত। জড়বাদ-ভোগবাদের যে জোয়ার বিশ্বব্যাপী চলছে তার ঝাপটা থেকে এ সমাজ একেবারে মুক্ত নয়। তথাপি ইসলামী বিধান জারি থাকার কারণে তা এক সচেতন পাশ্চাত্যবাসীর চোখে "পরীর রাজ্য" মনে হয়েছে। ইসলামকে তার সমুদয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে কায়েম থাকতে দেখলে তিনি তাকে বর্ণনার ভাষাই খুঁজে পেতেন না।

জড়বাদী-ভোগবাদী সভ্যতার এখন স্বর্ণযুগ। এ সভ্যতা মানবতাকে কি দিতে পারে বিশ্ব তা দেখছে। বিশ্ব এটাও দেখেছে ইসলাম তার স্বর্ণযুগে কি দিয়েছে এবং যুগে যুগে কি দিয়ে আসছে। এ দুটি বিপরীত চিত্র সামনে থাকার পরও যদি আমরা অন্ধের মতো পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি, তাহলে আগামী প্রজন্ম আমাদের থুথু নিক্ষেপ করে বলবে, "এই নির্বোধের দল আমাদের জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দিয়ে গেছে।"■

লেখক-পরিচিতি : অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান- প্রাবন্ধিক, প্রভাষক-ইংরেজী বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ, চুয়াডাঙ্গা।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতা

ড. মাহফুজ পারভেজ

■

এক.

মূলত ১৯৮০ দশকে আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও রাষ্ট্রসমূহ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় খাতে অর্থ যোগান দেওয়ার হার কমিয়ে এনজিও বা বেসরকারি খাতে তা বৃদ্ধি করে। স্পষ্টতই কাঠামোগত সমন্বয় নীতি বা Structural Adjustment Policy বাস্তবায়নের জন্য পাবলিক সেক্টরের ব্যাপক পুনর্গঠনের নামে সংকোচন সাধন এবং প্রাইভেট সেক্টরের বিস্তৃতি ঘটানোর আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ও রাজনীতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতাতেই সে সময় এনজিওদের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। [বিস্তারিত দেখুন, John Farrington, Reluctant Partners, London: Routledge, 1993. p. 7] বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ কোন রাজনীতি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান নয় এবং বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন নীতি [মুক্ত বাজার অর্থনীতি, পুঁজিবাদের বিকাশ, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি] বাস্তবায়নে যেহেতু তারা এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও রাষ্ট্র, বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন, অঙ্গীকারাবদ্ধ, সেহেতু তাদের অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওসমূহ রাজনীতি নিরপেক্ষ হবে বলে আশা করা অমূলক।

আপাতদৃষ্টিতে এনজিওসমূহ অরাজনৈতিক কাঠামো ও প্রকৃতি নিয়ে কাজ করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এদের উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তৃতির সঙ্গে কোন কোন বিশেষ আদর্শ ও রাজনীতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এনজিওসমূহ কিভাবে অত্যন্ত চতুরতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মকাে ত ও গবেষক কাজটিকে 'সাম্রাজ্যবাদের সেবা' বা 'সার্ভিস অব ইমপিরিয়েলিজম' নামে অভিহিত করেছেন:

www.bjilibrary.com

"Incorporating the poor into the neo-liberal economy through purely 'private voluntary action' the NGOs create a political world where the appearance of solidarity and social action cloaks a conservative conformity with the international and national structure of power."

[সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নব্য-উদারতন্ত্রী অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করে এনজিওরা এমন একটি রাজনৈতিক জগৎ তৈরি করে, যেখানে সংহতি ও সামাজিক অ্যাকশনের ঢাকনা দিয়ে ঐতিহ্যগত প্রথাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতা কাঠামো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।]

বিস্তারিত দেখুন : [James Petras, 'NGOs in the Service of Imperialism', Journal of Comtemporary Asia, Vol: 29, No: 4, 1999, [Manila] p. 435.]

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও এনজিওদের রাজনৈতিক আচরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মূলত স্বাধীনতার পরে ত্রাণ, পুনর্বাসন তথা মানবিক সাহায্য কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশে এনজিওসমূহ কাজ শুরু করলেও কালক্রমে পরিমাণগত এবং মাত্রাগত উভয় দিক থেকেই তাদের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতার ইঙ্গিত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে এদের প্রারম্ভিক কর্মকা , লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তৎপরতার সঙ্গে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই অধিক হারে পরিলক্ষিত হচেছ। বিশেষ করে, অরাজনৈতিক ও অলাভজনক হিসাবে দাবি করলেও হাল আমলে এনজিওসমূহ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং বাণিজ্য ও মুনাফার পথে চলছে। সরকার ও নানা সংস্থা থেকে এনজিওদের মৌলিক তৎপরতাগত ক্ষেত্রে স্খলনজনিত কারণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উত্থাপিত হলেও কাজের কাজ খুব একটা হয় নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের চর্চা এবং এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনে অরাজনৈতিক এনজিও গোষ্ঠীর রাজনীতি সম্পৃক্ততা ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করবে। এমন কি, খোদ এনজিও মহলেও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রশ্নে তীব্র বিভেদ ও মত-পার্থক্য বিরাজ করছে এবং এনজিওসমূহ এ প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে এনজিওদের রাজনীতি সম্পৃক্ততা ও হস্তক্ষেপ নিয়ে এতো সমস্যার সৃষ্টি করেছে মূলত তাদের বিতর্কিত কার্যক্রম। এনজিওসমূহ এদেশের রাজনীতি ও নির্বাচনে সময় সময় নানাভাবে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হওয়ার ফলেই এমন সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশের ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের ভোটদানে উৎসাহিতকরণ, খেলাপিদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে না দেওয়া, সংসদে নারী নেতৃত্ব প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে প্রতিষ্ঠাকরণ, ফতোয়া প্রসঙ্গে সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে বিশেষ একটি দলের পক্ষে ব্যবহারকরণ, সরকারকে হঠাতে বা চাপ দিতে

www.bjilibrary.com

বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় 'ঢাকা অবরোধ' বা 'মহা সমাবেশ' করাসহ বহুবিধ রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে বহু এনজিও সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক ইস্যুতে ও নির্বাচনের প্রাক্কালে অনেক এনজিওর মাধ্যমে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে অর্থের ও লোকজনের সমাবেশ ঘটানো, পোস্টার-প্রচার পত্র প্রকাশ, উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ, নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে দলীয় প্রার্থীদের পক্ষাবলম্বনসহ এমন অনেক বিতর্কিত তৎপরতা গৃহীত হয়, যা কেবল রাজনৈতিক বা দলীয় কাজই নয়, বরং এনজিও বা উন্নয়ন সংস্থার মৌলিক নীতি, আদর্শ, চরিত্র ও শপথের পরিপূর্ণ খেলাপও বটে। এহেন পরিস্থিতিতে এনজিওসমূহ তাদের ঘোষিত কাজের বাইরে নানা ধরনের এডভোকেসি, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, মনিটরিংসহ বহুবিধ কাজ অব্যাহত রাখায় এদেশে বিকাশমান গণতন্ত্র ব্যাহত হওয়ার এবং আসন্ন নির্বাচন (২০০৭) প্রভাবিত হওয়ার মতো আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

এমনিতেই এনজিওসমূহ তাদের দাতা ও নিয়ন্ত্রকদের আদর্শ, বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সাংবাৎসরিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত গতিতে চালিয়ে থাকে; যাতে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতিকে দাতাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী প্রভাবিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করার নামে সুদ ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্তিত করা;

মানবাধিকার রক্ষার নামে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা, ধর্ম ও জাতীয়তার মানুষকে উত্তেজিত করে সম্প্রীতি বিনষ্ট করা;

বিদেশে বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ, সমস্যাগ্রস্ত, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারী নির্যাতনের কল্পিত চিত্র তুলে ধরে দেশের ইমেজ নস্যাৎ করে ঋণ-সাহায্য-অনুদান হাসিলের চেষ্টা করা;

নারীর ক্ষমতায়নের নামে চিরায়ত পরিবার প্রথা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা;

উন্নয়নের ছদ্মাবরণে দেশের পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত ও দরিদ্র অঞ্চলে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করা;

জাতীয় ঐক্যমতের মৌলিক বিষয়বস্তু, যেমন, ধর্ম, স্বাধীনতার চেতনা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতির সদস্যদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য প্রসার করা;

জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতিকে বাংলাদেশে আপামর মানুষের চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাসের বিপরীতে পশ্চিমা ভোগবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আত্মতুষ্টিবাদের আলোকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা;

সর্বাবস্থায় ধর্ম তথা ইসলামকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা;

গ্রামে-গঞ্জে ইসলামী বিধান ও জীবনাচারের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ অবস্থান তৈরি করা;

www.bjilibrary.com

আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় পাঠ্যক্রমের বিপরীতে পশ্চিমা ভোগবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চেতনা জনগণের মধ্যে প্রচারে সচেষ্ট থাকা;

পত্র-পত্রিকা-টিভি-রেডিও তথা মিডিয়াকে কব্জা করে তাদের এবং তাদের দাতা গোষ্ঠীর আদর্শ-উদ্দেশ্য-মতবাদের বিস্তার ঘটানো;

সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তৎপরতা ও প্রণোদনা দিয়ে তাদের লুক্কায়িত রাজনীতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শের আলোকে সামাজিক বিবর্তন ঘটিয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস, আদর্শ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিপরীত 'দাতা-পছন্দ' সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুপ্ত-সংগ্রাম করা।

অতএব, শুধু নির্বাচন এলেই এনজিওদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও তৎপরতাকে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন তাদের সামগ্রিক কার্যক্রমকে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অডিট, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনার জন্য যথাযথ আইনী ও নীতিগত পদক্ষেপ নিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তৈরি করা। তবে, যেহেতু আগামী ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক-সাংবিধানিক রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী আদর্শের স্বকীয়তা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু বিদেশি অর্থপুষ্ট এনজিওদের আদর্শ, রাজনীতি ও নির্বাচন কেন্দ্রীক তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া আমাদের সকলেরই আশু ও অবশ্য কর্তব্য।

দুই.

আমরা এনজিওদের বিস্তারিত সংজ্ঞায়ন, শ্রেণীকরণের দিকে না গিয়ে এদের রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ও আদর্শ প্রচারের প্রচেষ্টাকেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে আলোচনা করবো এবং এহেন বিপদের কবল থেকে পরিত্রাণের পথ ও পন্থা অনুসন্ধান করবো। তবে আলোচনার প্রয়োজনে মোটামুটিভাবে এনজিও বলতে কি বুঝায় এবং এদের কত রকমের সংস্থা বা কার্যক্রম রয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরবো। মোদ্দা কথায় এনজিও মানে 'নন গভার্মেন্টাল অর্গানেইজেশন' বা বেসরকারি সংস্থা। সরকারি নয়, এমন সকল সংস্থাই সাধারণ বিবেচনায় এনজিও। তবে বিশেষ অর্থে এনজিও হলো তারাই যারা সরকারের অংশ না হয়েও সমাজের নানা প্রয়োজনে, যেমন সমাজ কল্যান, দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি কাজে তৎপর হয়। এদের মধ্যে নানা ধরনের সংস্থা রয়েছে। আমেরিকাতে যাদের গ্রাসরুট বা তৃণমূল সংস্থা বলে। সমস্যা হলো আমেরিকা বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজের নানা প্রয়োজনের বাস্তব সম্মত তাকিদে স্বাভাবিকভাবেই সংস্থাসমূহ গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে বহু সংস্থাই আরোপিত বা কোন দাতা বা গোষ্ঠীর ইঙ্গিতে বা আদর্শ বা রাজনীতির ইন্ধনে প্রতিষ্ঠিত। এদের শ্রেণীকরণের কাজটিও বেশ জটিল। কারণ তারা বর্তমানে 'জুতা সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ' পর্যন্ত সকল কাজই করছে। বেশ কিছু তো

www.bjilibrary.com

অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে পড়েছে, যাদেরকে বর্তমানে বলা হচ্ছে 'মাইক্রো ক্রেডিট অর্গানেইজেশন' বা ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা। এর বাইরে রয়েছে অ্যাকশন এনজিও, যারা সরাসরি কোন ব্যাপারে কাজ করে; রয়েছে রিসার্স এনজিও বা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বা সিভিল সোসাইটি, যারা রাজনীতি, অর্থনীতি, নাগরিকতা সংশ্লিষ্ট নানা নীতি ও আইনগত দিকে কাজ করে; রয়েছে সার্পোট এনজিও, যারা এনজিওদের নানা লজিস্টিক সার্পোট দেয়; রয়েছে শ্রেণী বা পেশা বা গোষ্ঠী বা অঞ্চলভিত্তিক এনজিও, যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ করে। কাজের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করলে আমরা দেখবো হেন বিষয় নেই, যাতে এনজিওরা অনুপস্থিত। শিশু অধিকার, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার, এথনিসিটি, সেক্সুলজি, হেল্‌থ এ্যান্ড হাইজিন, রিপ্রোডাক্টিভ হেল্‌থ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, সাক্ষরতা, মানবাধিকার, উন্নয়ন, এমপাওয়ারম্যান্ট, সচেতনতা সৃষ্টি, গণতন্ত্রায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে তৎপর রয়েছে এনজিওরা। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দাতা সংস্থা ও রাষ্ট্রসমূহের আগ্রহ ও বরাদ্দের দিকে নজর দিয়েই এনজিওরা তাদের এজেন্ডা বা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে। যেমন, এক সময় সবাই হামলে পড়েছিল জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে আর এখন মাতামাতি করছে সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উদারীকরণ প্রভৃতি ইস্যুতে। ইস্যুর বৈচিত্র্য আর কাজের তালিকার সঙ্গে বাস্তবের ফলাফল যে অনেক সময়ই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, এমন কথাও শোনা যায়। অভিযোগ ওঠে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন যেমনই হোক না কেন, এনজিও-সংশ্লিষ্টদের গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদি বস্তুগত উন্নয়ন ঠিকই হয়। যে কারণে এদেশের হুজুগে মানুষ এনজিও-এর দিকে প্রলুব্ধভাবে তাকিয়ে থাকে তাদের আয়-রোজগার-তরক্কি-কর্ম সংস্থানের জন্য। এমন কি, সত্তর দশকে যেমন চায়নিজ হোটেলের ব্যবসায় রমরমা দেখা যায়, তেমনই আশি-নব্বুই দশকে এনজিও করার হিড়িক লেগে যায়।

এ কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এনজিও কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'ব্যাঙের ছাতার মতো বিস্ফোরণ'। জাতিসংঘের উন্নয়ন রিপোর্টে (১৯৯৩) মন্তব্য করা হয়েছে :

'An explosion of participatory movements or non-Governmental Organizations ... peoples participation is becoming the central issue of our time.'

[অংশগ্রহণমূলক আন্দোলন বা এজিওর বিস্ফোরণ...(এতে) জনগণের অংশগ্রহণ আমাদের সময়ের কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হচ্ছে।]

এই যে 'এনজিও বিস্ফোরণ' বা 'ব্যাঙের ছাতা'র মতো বিকাশ---এরও বাস্তবতা রয়েছে। সমাজ ও রাজনীতিতে কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ অবশ্যই থাকতে হয়। এনজিওদের উত্থান ও বিকশিত হওয়ার প্রেক্ষাপট হিসাবেও তেমন অনেক কারণ দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, দেশ-কাল-অঞ্চলভেদে এ বিকাশধারার মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষণীয়। তবে সাধারণভাবে,

www.bjilibrary.com

বিশেষজ্ঞরা এনজিওদের উদ্ভব ও বিকাশের কয়েকটি প্রধান ধারাকে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করেছেন : (বিস্তারিত দেখুন): [James Petras, 'NGOs in the service of Imperialism', Journal of Contemporary Asia, Vol 29, No 4, 1999, p. 431]:

প্রথমতঃ স্বৈরাচারী সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত কর্মকাণ্ডের মোকাবেলায় ও সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রচলনের দাবিতে কিছু কিছু এনজিও সংগঠনের জন্ম হয়। এরা মূলতঃ সমালোচক ধরনের সংস্থা। এমন এনজিও সংগঠনের তৎপরতা দেখা গিয়েছিল অনেক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে, যেমন, মার্কোসের শাসনাধীন ফিলিপাইনে, পিনোচেটের শাসনাধীন চিলিতে, পার্ক শাসনাধীন দক্ষিণ কোরিয়াতে এবং বাংলাদেশের এরশাদ শাসনামলেও 'বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ' বা এমনতর আরও অনেক অধিকারভিত্তিক এনজিও-এর জন্ম, বিকাশ ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নকামী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণআন্দোলন বা গণঅভ্যুত্থানের সময় 'র‍্যাডিক্যাল' চরিত্রের এনজিওদের বিকাশ ঘটে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়। সত্তরের দশকে ইন্দোনেশিয়ায়, থাইল্যান্ড ও পেরুতে; আশির দশকে নিকারাগুয়া, চিলি, ফিলিপাইনে এবং নব্বুই-এর দশকে আল-সালভাদর, গুয়েতেমালা, দক্ষিন কোরিয়াতে গণআন্দোলনমুখর পরিস্থিতিতে এ ধরনের এনজিওদের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। বাংলাদেশেও এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় এমন চারিত্রিক বৈশিষ্টের এনজিও অধিকহারে গড়ে উঠতে দেখা গেছে, যারা পরে তাদের অরাজনৈতিক অবস্থানকে ভুলে গিয়ে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভঙ্গুর, দুর্নীতিগ্রস্ত, অদক্ষতার ফলেও এনজিওদের উত্থান ঘটেছে। কোন প্রকল্প বা কর্মসূচি, যেমন দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রাম উন্নয়ন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অপারগতা বা ব্যর্থতার প্রমান দেওয়ায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিওসমূহের ডাক পড়ে এবং তারা সে সুযোগে আত্মবিকাশে সমর্থ হয়।

চতুর্থতঃ বর্তমান বিশ্বে সকল কাজের স্বচ্ছতা রাখার জন্যে এবং জনগণের অংশ গ্রহণ বাড়ানোর প্রয়োজনে কেবল মাত্র সরকারের মাধ্যমে কাজ করার ধারার বদলে উন্নয়ন সংগঠন বা এনজিওদের মাধ্যমে কাজ করানোর প্রবণতা থেকেও এদের বিকাশ ও স্ফীতি ঘটেছে।

পঞ্চমতঃ, এনজিওসমূহের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে সাম্রাজ্যবাদের নব্য আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপটে, যখন মুক্তবাজার অর্থনীতি, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী আদর্শের সমন্বয়ে বিশ্বায়নের পাগলা ঘোড়া দাবিয়ে দিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব উন্নয়নকামী তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে পৌনঃপুনিক ও গভীর অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব ঘটায়, তখন। সেসময়, আয়ের নতুন

www.bjilibrary.com

উৎসের সন্ধানে সেসকল দেশের বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, শিক্ষক গবেষণা, সমন্বয়, কন্সালটেন্সিতে লিপ্ত হয় নানা এনজিওর মাধ্যমে। বলা হয়, পশ্চিমা রাষ্ট্র ও সংস্থা তাদের মতবাদ, আদর্শ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে একদল 'লোকাল' এজেন্টের প্রয়োজন অনুভব করে, এরা সে সুযোগকে কাজে লাগান।

এখন আমরা একে একে বাংলাদেশে এনজিও-এর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এদের উদ্ভব, বিকাশ, বিদেশি সাহায্য, আদর্শিক অবস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণেচ্ছা, সরকারের সঙ্গে সম্পর্কসহ নানাবিধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিয়ে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করবো।

তিন.

বাংলাদেশে এনজিওদের উদ্ভব ও বিকাশ মূলত চারটি ধাপে বা স্তরে সংঘটিত হয়েছে [বিস্তারিত দেখুন : Richard Holloway, Supporting Citizens Initiatives, Dhaka: UPL, 1998. p. 20]

প্রথমতঃ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রাকৃতিক ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের প্রতি মানবিক সাহায্যের প্রয়োজনে;

দ্বিতীয়তঃ ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ-পরবর্তীকালে ত্রাণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে;

তৃতীয়তঃ ১৯৮০-এর দশকে সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনের মাধ্যমে; এবং

৯০ দশকের শেষে এবং বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও ধনতন্ত্রী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সহযোগী হিসাবে।

বাংলাদেশে এনজিও বিস্ফোরণ ও তাদের বির্তকিত কার্যক্রমের ফলে সরকার, জনগণ, সুধী সমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বহু আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। এদের বিতর্কিত কার্যক্রম ও নানা সমালোচনা সম্পর্কে আলোকপাতের পূর্বে আমরা এনজিও কার্যক্রমের বা ভূমিকার একটি প্রকাশ্য বা ঘোষিত চিত্র তুলে ধরতে পারি, যেখানে দু'টি প্রধান দিক সাধারণভাবে দেখা যায়, যার বাইরেও তাদের অনেক অঘোষিত কাজ লক্ষণীয় :

প্রথমতঃ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তা করা; এবং

দ্বিতীয়তঃ দেশের যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র কাজ করে না কিংবা করতে পারে না, সেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা প্রান্তিক ক্ষেত্রে কাজ করা।

খানিকটা ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এনজিও কার্যক্রমের বা ভূমিকার বিষয়টি অনুধাবণ করতে পারি। ১৯৭১ সালে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও মানবতার প্রতি সাহায্যের মানসিকতা নিয়েই জাতিসংঘ মিশন সর্বপ্রথম এদেশে আসে। United Nations Relief Operation in Dhaka (UNROD) নামের এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে সাথেই আরও কিছু এনজিও একই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। [বাংলাদেশে এনজিওসমূহের ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য দেখুন :

www.bjilibrary.com

D.J. Lews, 'Catalysts for Change? NGOs, Agriculture Technology and the State in Bangladesh', The Journal of Social Studies, No: 65, July 1994, Dhaka. P. 11] অবশ্য এরই আগে, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের মাধ্যমেও কিছু এনজিওর যাত্রা শুরু হয়। দেখা যাচ্ছে এদেশে এনজিওরা প্রথম কাজ শুরু করে মানবতার কল্যাণের প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই; যদিও পরবর্তীতে তাদের কাজ কেবল মাত্র মানবিক বা উন্নয়ন বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে নি; সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মান্তকরণের মতো স্পর্শকাতর বিষয়েও ছড়িয়ে যায়, যা আমরা পরে আলোচনা করবো।

বর্তমান বাংলাদেশে ১৩০০০ রেজিস্ট্রিকৃত এনজিও রয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে ৬০০টির মতো এনজিও যুক্ত রয়েছে উন্নয়নমূলক কর্মকাে। [The Daily Star, May 25, 2004] বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে আমলানির্ভর প্রতিষ্ঠান 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরো' কাজ করছে। 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র রেজিস্ট্রিকৃত এনজিও-এর সংখ্যা ১৭০০ এবং এরা শুধু ২০০১ সালেই ১৩০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি এনজিওসমূহ নিজস্ব সমিতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজস্ব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন কৌশল বা স্ট্রাটেজি গ্রহণ করে থাকে। এনজিওদের এই সমিতি বা সমন্বয় ফোরাম 'এডাব' (ADAB-Association of the Development Agencies in Bangladesh) নামে পরিচিত। ২০০০ সাল পর্যন্ত এডাব-এর সদস্য সংখ্যা জানা যায় ১২৮৬। এখানে স্পষ্টতঃ 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরো' এবং 'এডাব'-এর অন্তর্ভুক্ত এনজিওদের সংখ্যাগত তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। কারণ অনেক স্থানীয় এনজিও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত।

চার.

তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে তৎপর এনজিওসমূহের প্রাপ্ত বিদেশি সাহায্যের পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক দশকে সাহায্যের পরিমাণ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। [সারণী দ্রষ্টব্য]

এনজিও খাতে বৈদেশিক সাহায্যেও এক দশকের চিত্র (১৯৯০/৯১-২০০০/০১)

সাল	অনুমোদিত বিদেশি সাহায্য (কোটি টাকা)	অনুমোদিত বিদেশি সাহায্য (মিলিয়ন ডলার)	ছাড়কৃত বিদেশি সাহায্য (কোটি টাকা)	ছাড়কৃত বিদেশি সাহায্য (মিলিয়ন ডলার)
১৯৯০-'৯১	১২০২.৪২	৩৩৭	৮০৬.৩৭	২২৬
২০০০-'০১	৩৮৭৯.৭২	৭১৯	২৭০৮.৭৯	৫০২

[সূত্র : Economic Relation Department (ERD), GOB, 'Flow of External Resources into Bangladesh, 10 March, 2002.]

www.bjilibrary.com

[১৯৯০-৯১ এবং ২০০০-০১ সময়কালে ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ৩৫.৬৮ টাকা এবং ৫৩.৯৬ টাকা।

ওপরের সারণীর আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ১৯৯০-'৯১ এবং ২০০০-'০১ অর্থবছরে সাহায্য বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্রে এনজিওদের প্রতি বিদেশিদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতার মাত্রা বৃদ্ধিকেও সপ্রমাণিত করে। শুধু তাই নয়, সরকারকে প্রদেয় বিদেশি সাহায্যের চেয়ে এনজিওদের প্রতি সাহায্য বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯৯০-'৯১ এবং ২০০০-'০১ অর্থবছরে সরকার ও এনজিও-এর সাহায্য প্রাপ্তির অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১:০.২৫ এবং ১:০.৩৫। একই সময়কালে বিদেশ থেকে সরকার ও এনজিও যত সাহায্য পেয়েছে, তা একত্রে ধরলে দেখা যায়, এনজিওরা ১৯৯০-'৯১ সালে পায় মোট সাহায্যের ২০ শতাংশ এবং ২০০০-'০১ সালে পায় ২৬ শতাংশ। [সূত্রঃ Economic Relation Department (ERD), GOB, 'Flow of External Resources into Bangladesh, 10 March, 2002.] বলা বাহুল্য, এনজিওদের প্রতি বিদেশি আগ্রহ, নির্ভরশীলতা এবং সাহায্য প্রদানের হার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কেন সেটা দিনে দিনে বাড়ছে, তা' খতিয়ে দেখা দরকার।

লক্ষণীয় বিষয় হলো এনজিওরা দেশের ভেতরে কাজ করলেও জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিপালন করে বিদেশি দাতাদের। কারণ, এনজিওদের প্রাপ্ত ও প্রাপ্তব্য সাহায্যের পরিমাণ দাতা প্রতিষ্ঠানই নির্ধারণ করে। বিধি অনুসারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো শুধু অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করে। এনজিও, সাহায্যদাতা ও বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম-কানুনের জন্যই কেবল সরকারের মাধ্যমে এই সাহায্য দেওয়া হয় মাত্র। এখানে সরকারের ভূমিকা গৌণ। টাকার আয়-ব্যয়-খরচের হিসাব, গৃহীত কার্যক্রম ও নীতিমালাসহ নানা ব্যাপারে এনজিওদের পক্ষ থেকে সরকারকে জবাবদিহি করার কোন আইন বা প্রশাসনিক বিধান নেই।

পাঁচ.

১৯৯০-পূর্ব সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের এনজিওসমূহ রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ও বিষয়বস্তুসমূহ প্রকাশ্যে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু ১৯৯০ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যে নবঅভিযাত্রা শুরু হয়, সেখানে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতায় এনজিওসমূহ অধিকভাবে রাজনীতি-সচেতন ও রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। সকলের মনে নিরপেক্ষ উন্নয়ন সংগঠন এনজিওদের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থানের ব্যাপারে ক্ষোভ, সন্দেহ ও আপত্তি থাকলেও দাতাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন এবং বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের আগ্রহেই তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটাতে পেরেছিল। এক্ষেত্রে এনজিও-রাজনীতি সম্পর্ক নির্ধারণে তিনটি উপাদান কাজ করেছে। যেমন :

www.bjilibrary.com

৯০-এর গণআন্দোলন;

৯১ সালের নির্বাচন; এবং

ইসলামের বিকাশ ও বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে।

১৯৯০-এর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের উত্তাল দিনগুলোতে যখন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল---বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নানা বামপন্থী দলসহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক-কর্মচারি ঐক্য পরিষদ, পেশাজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক সংগঠন সরাসরি মাঠে নামে, তখন এনজিওরাও সে সুযোগকে কাজে লাগায়। সে সময় এনজিওদের সংগঠন 'এডাব' স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে তৎকালীন সভাপতি ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরীর আপত্তি সত্ত্বেও অগ্রসর হয় এবং এনজিওদের রাজনীতিতে সংস্পৃক্তকরণের পক্ষের নেতা হিসাবে কাজী ফারুক আহমদ নেতৃত্ব দখল করেন। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে কাজী ফারুকের নেতৃত্বে এডাবের নতুন নির্বাহী কমিটি বিশেষ কিছু রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। এভাবেই মূলত বাংলাদেশে এনজিওসমূহের প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার শুরু হয়; যদিও কাজী ফারুকের 'প্রশিকা' , ফ.র. মাহমুদ হাসানের 'গণ সাহায্য সংস্থা'সহ আরও অনেক এনজিও দেশের কোন কোন এলাকায় রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়, লোক সংগ্রহ ও জনসংযোগ শুরু করা ছাড়াও নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা প্রদান করে। একই সময়, অর্থাৎ ১৯৯১ সালে এডাব-এর নির্বাহী পরিচালক 'এনজিও মেনিফেস্টো' তৈরি করেন, যাতে নতুন সরকারের কাছে এনজিওদের চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরা হয় এবং যেগুলোর মর্মকথা ছিল রাজনৈতিক।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচন-পরবর্তী নতুন সরকারের নিকট এনজিওদের চাওয়া-পাওয়া অনেকাংশে বেড়ে যায়। এ সময় একজন এনজিও নেতা সরকারের পূর্ণ মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ পান; যদিও পরবর্তীতে তিনি এক সরকারি নীতি-নির্ধারণী সেমিনারে মন্তব্য করেন যে: " দেশে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আছে, তাই এনজিওদের প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে।" [বিস্তারিত দেখুন: Richard Holloway] পরিবর্তিত অবস্থায় এনজিওরা নতুন কৌশল গ্রহণ করে এবং সে সময় তাদের পক্ষ থেকে বলা হয় :

"Just as the transition to electoral democracy does not solve all political problems, nor does it solve bureaucratic inefficiencies in the public sector". [বিস্তারিত দেখুন: Richard Holloway]

অর্থাৎ, এনজিওরা কেবলমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই সকল রাজনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে, পাবলিক সেক্টরে আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা দূরীভূত হবে বলে মনে করেনি। তারা আরও ব্যাপক রাজনৈতিক সংস্কার ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত করতে থাকে। সে সময় সরকারের কাছে প্রশাসন, ধর্ম, সংস্কৃতি বিষয়ক নানা পরিবর্তন ও সংস্কারের দাবিসহ এনজিওরা প্রচারণা শুরু করে যে, "সরকার ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এনজিওদেরকে

www.bjilibrary.com

তাদের কাজে হুমকি বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।" [বিস্তারিত দেখুন: Richard Holloway] এর ফলে সরকার-এনজিও সম্পর্ক নতুন দিকে মোড় নেয়। এ সময়ে ১৯৯১ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে এনজিও, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, সেনা বাহিনী ও মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী ['অপারেশন সী এনজেলস' নামে খ্যাত] সমন্বিতভাবে কাজ করে এবং সরকার-এনজিও সম্পর্ক কিছুটা ইতিবাচক দিকে অগ্রসর হয়। 'এডাব' এ সময়ে দাতা, সরকার ও এনজিওদের মধ্যকার মূল মধ্যস্থতাকারী হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ-কেন্দ্রীক ত্রাণ ও পুর্নবাসন কাজের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এনজিও-সরকার সম্পর্কের সাময়িক অগ্রগতি থমকে যায়। পাশাপাশি এনজিওদের বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা তাদের স্ব স্ব এলাকায় নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য এনজিওদের ওপর প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়। এমতাবস্থায়, এনজিওদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সংসদ সদস্য ও আমলাদের সঙ্গে এনজিওদের সম্পর্কে নতুনভাবে টানা-পোড়েন সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে এনজিও সংক্রান্ত আইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন সমন্বিত আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি মন্ত্রী পরিষদ উপ-কমিটি গঠিত হয়। এনজিওরা উক্ত কমিটির ব্যাপারে তীব্র অসন্তুষ্টি জানায় এবং উক্ত উপ-কমিটি কর্তৃক প্রণীত 'NGO Regulation and Control' খসড়া বিলের বিরোধিতা শুরু করে।

বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশেও ইসলামের উত্থানের সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে এনজিও-সরকার সম্পর্কে পালাবদল দেখা যায়। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পশ্চিমা শক্তি সমাজতন্ত্রের পতনের পর ইসলামকেই সবচেয়ে বড়ো প্রতিপক্ষ এবং সম্ভাবনাময় শক্তি মনে করে। যে কারণে তারা (দাতারা) তাদের ভোক্তাদের (দাতা গ্রহীতা/এনজিও) ইসলামী পুনর্জাগরের বিরুদ্ধে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। আর এনজিওসমূহ যেহেতু বামপন্থীদের দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্ট তাই তারাও ইসলামের বিরোধিতার কাজে যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রবন্ধে পরবর্তী অংশে আমরা এনজিওদের রাজনীতি ও আদর্শ নিয়ে আলোচনাকালে আরও দেখতে পাবো যে, সমাজতন্ত্রের পতনের পর ব্যর্থ মনোরথ ও বিভ্রান্ত বামপন্থীদের সম্পূর্ণ বিপরীত-মেরুর পশ্চিমা পুঁজিবাদী পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার পেছনে ইসলাম ঠেকানোও একটি বড়ো এজেন্ডা ছিল এবং দাতা ও গ্রহীতা তথা পশ্চিমা শক্তি ও এনজিও---উভয়েরই মধ্যেই ইসলামের পুনরুত্থানের প্রতিরোধকল্পে এক ও অভিন্ন স্বার্থ লক্ষ্য করা যায়। গবেষক হলওয়ের মতে: "বাংলাদেশে ১৯৯১-পূর্ববর্তী এনজিও-সরকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল দ্বন্দ্ব ছিল সরকারি আমলাদের সঙ্গে এনজিওসমূহের লড়াই। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী জাতীয় সংসদে ইসলামী দলের (জামায়াতে ইসলামী) প্রভাব বৃদ্ধি এ দ্বন্দ্বকে নবতর মাত্রায় নিয়ে যায়।" [বিস্তারিত দেখুন: Richard Holloway] সে সময় ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে চড়া হারে সুদ গ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়নের নামে পর্দা প্রথা বিনষ্ট ও অশ্লীলতার বিস্তার, নারীর ক্ষমতায়নের নামে সামাজিক ভারসাম্য বিপন্ন করা, ধর্মনিরপেক্ষ

www.bjilibrary.com

শিক্ষা বিস্তার, পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোসহ নানা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও এনজিওর নামে বেনিয়াবৃত্তির বিরুদ্ধে তীব্র জনমত ও আন্দোলন সংঘটিত হয়। এ সময় এনজিওরা তিনটি কৌশল গ্রহণ করে অগ্রসর হয়, যা তাদের রাজনৈতিক ও আদর্শিক অবস্থানকে উন্মোচিত করে:

প্রথমত বিদেশি দাতা ও দেশের ভেতরকার বন্ধুদের নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন, তৎপরতা ও চাপের মাধ্যমে সরকারকে এনজিও বিরোধী সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের ব্যাপারে ক্ষেপিয়ে তোলা;

সরকারের মধ্যে নিজস্ব সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তোলা; এবং

বামপন্থী ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধি নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা।

প্রকৃতপক্ষে, এ সময়ে এনজিওরা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, সাংস্কৃতিক জোট ও বামপন্থী সংগঠনের সঙ্গে প্রকাশ্যে ও গোপনে সম্পর্ক গভীর ও জোরদার করে। এভাবে রাজনীতিতে এনজিওরা একটি সরাসরি ও স্পষ্ট অবস্থান নিয়ে ইসলামের উত্থানের বিরুদ্ধের রাজনীতিকে সজিব ও শক্তিশালী করে। হলওয়ে মনে করেন : "১৯৮৮ থেকে ১৯৯৪---এই ছয় বছর এনজিওরা তাদের নিরপেক্ষ ও উন্নয়নকামী অবস্থান বদল করে একই সঙ্গে বামপন্থী ও পশ্চিমা উদারপন্থী তথা ইসলামের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্থান বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে কৌশলগত ও আদর্শিক জোট বা মৈত্রী গঠন করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মজবুতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।" [বিস্তারিত দেখুন : Richard Holloway]

১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিওদের একটি বড়ো অংশ সরাসরিভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে সমর্থনের নামে বাম-ধর্মনিরপেক্ষ-ভোগবাদী আদর্শের রাজনীতির শক্তিকে সমর্থন করে এবং তৃণমূল জনতার সম্মেলনের নামে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষক শক্তিকে বিজয়ী করতে মরিয়া হয়ে কাজ করে। গবেষক ইন্দ্রজিৎ কু-র মতে : "স্বভাবতই ১৯৯৬-২০০১ সালের ক্ষমতাসীন সরকারের তথা আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের সঙ্গে এনজিওদের একটি সুসম্পর্ক বিরাজ করে।" [বিস্তারিত দেখুন : ইন্দ্রজিৎ কু, "বাংলাদেশে এনজিও-রাজনীতি সম্পর্ক : ইতিহাস ও বিবর্তন", ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪১০ বাংলা, পৃ: ১৩]

কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি'র নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক আদর্শকে ভিত্তি করে জনরায়ে ব্যাপক নির্বাচনী বিজয় অর্জন করায় এনজিও-রাজনীতি সম্পর্ক আরেকটি পর্যায়ে উপনীত হয়। সে সময় একদল এনজিও সংগঠন অতীতের ভুল সংশোধন করে যে কোন ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ

www.bjilibrary.com

থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে কেবল মাত্র উন্নয়ন ও অরাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকে। কিন্তু আরেক দল রাজনৈতিক, বিশেষ করে ইসলামী পুনর্জাগরণ বিরোধী বাম-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-ভোগবাদী রাজনৈতিক কর্মকা পরিচালনা অব্যাহত রাখে। এরা কোন কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে লোক ও অন্যান্য সহযোগিতা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে সরকার কোন কোন এনজিওর অফিস তল্লাসী ও কর্মীদের গ্রেফতার করে। বস্তুত পক্ষে ২০০১-পরবর্তী বর্তমান সময়কালে বাংলাদেশে এনজিওদের রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ কার্যক্রম বাংলাদেশ বা বিশ্বের অন্য কোথাও এতো তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয় নি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বা এনজিও তৎপরতায় এ ধরনের রাজনৈতিক-সম্পর্কযুক্ত ঘটনাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যাতে নিরপেক্ষ উন্নয়নকামী এনজিওরাও নানা প্রশ্ন ও বিতর্কের সম্মুখীন হয়। মূলত এ ধরনের রাজনৈতিক অভিপ্রায়যুক্ত এনজিও মানবাধিকার লঙ্ঘন, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু নির্যাতন, আইনের শাসনের অভাব, মৌলবাদের উত্থানের ঢালাও অভিযোগ এনে রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে ব্যাপক অপপ্রচার চালায়। দেশে ও বিদেশে বেশ কিছু পুস্তক ও প্রচার পত্র প্রকাশ এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজনের মাধ্যমে এদের প্রোপাগান্ডায় বিশ্বে বাংলাদেশের ইমেজের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং বাংলাদেশ পশ্চিমা রোষানলে পতিত হওয়ার মতো আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু বাস্তবে তাদের অভিযোগের কোন তথ্য, প্রমাণ ও ভিত্তি না থাকায় একটি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

ছয়.

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যেঃ "এনজিওরা তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের সামনে নিরাপদ আয়-রোজগারের এক নতুন জগতের উন্মোচন করেছে। বিশেষতঃ, প্রাক্তন র‍্যাডিকেল, বামপন্থী ও জনপ্রিয়/পপুলার বুদ্ধিজীবীদের এনজিওসমূহ রিক্রুট করে। এর ফলে কথিত মুক্তবিশ্ব তথা পুঁজিবাদী বিশ্বের সাথে বাম-বুদ্ধিজীবীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গ্রন্থীবদ্ধতার কারণে তৃতীয় বিশ্বে এনজিওদের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত সুসংবদ্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা হ্রাস পায়। (বিস্তারিত দেখুন): [James Petras,]

উপরোক্ত বাস্তবতায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশেও বুদ্ধিজীবীরা নতুন নতুন প্রত্যয়, তত্ত্ব ও ধারনা উদ্ভাবনের মাধ্যমে এনজিও কার্যক্রম বিস্তৃতিতে সহায়তা করছে। বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা, পেশাজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ অনেকেই তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস, আদর্শ, পূর্বতন চিন্তাচেতনা ও জীবনধারাকে পরিত্যাগ করে এনজিও ব্যবস্থাপনার আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারকে আঁকড়ে ধরতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের উর্ধ্বতন পদে বর্তমানে এদের দেখতে পাওয়া যাবে।

www.bjilibrary.com

অন্যদিকে, বিদেশি তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির কাজে এসকল বুদ্ধিজীবী যতোটা আগ্রহী ঠিক ততোটাই অনাগ্রহী গ্রামীণ দরিদ্র শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি বা গার্মেন্টস শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন প্রদানে।

বাংলাদেশের এনজিও কর্মকাণ্ডে দোদুল্যমান-মধ্যবিত্ত মানসিকতার সাবেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণের ফলে সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতিতে যে সকল নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, তা নিম্নরূপ:

সংগ্রাম-বিমুখ, আপোসকামী রাজনৈতিক কর্মকা উৎসাহিত হচ্ছে।

এনজিওদের কাঠামো, প্রকৃতি, অরাজনৈতিক উপস্থাপনা ও বিন্যাস ইত্যাদির ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বারোপ স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে রাজনীতিবিমুখ ও রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে।

এই সুযোগে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে ঋণ খেলাপি, সন্ত্রাসী, মাস্তান, এনজিও নেতৃত্ব, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল ও মিলিটারি আমলা, নানা পেশা ও বৃত্তির বুদ্ধিজীবীর মতো অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ।

এক ভিন্ন ঘরানার রাজনীতি প্রতিস্থাপন করা হয়, যা সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

উন্নয়নের নৈর্ব্যক্তিক তৎপরতা রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ, বিশেষভাবে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরোধী শক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ ও তৎপর হচ্ছে।

উন্নয়ন ও রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পার্থক্য বজায় থাকতে পারছে না; সংশ্লিষ্টরা তাদের অতীত রাজনীতি ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে বা এনজিওগুলোকে রাজনীতিতে ঠেলে দিচ্ছে।

উন্নয়ন-রাজনীতি-অংশগ্রহণের মধ্যে তাত্ত্বিক যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে রাষ্ট্র, ধর্ম, সংস্কৃতিকে আক্রমণ করছে

বস্তুত, বাংলাদেশের রাজনীতিতে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি বা বিশেষ কোন আদর্শ-এর বিকাশ, যা তাদের অতীত ও বর্তমান বিশ্বাসের অনুরূপ, সম্ভব হচ্ছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এনজিও নিয়োজিত বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণের প্রভাবের জন্যেই। এজন্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে এমপিদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশি অনুদানে 'পার্লামেন্টারি এফেয়ার্স ইনস্টিটিউট' তৈরির ক্ষেত্রে এনজিওদের প্রচুর আগ্রহ এবং এভাবে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়ও এনজিও কর্মকা রে সম্প্রসারণ ঘটছে। পাশাপাশি সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ধারাকে দাতা সংস্থা ও এনজিও কার্যক্রমের পক্ষে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে বিকল্প নীতি বা কৌশল বা পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বেও বর্তমানে নানা ধরনের এনজিওকে অতিতৎপর হতে দেখা যাচ্ছে। এভাবে দেশে আইন ও নীতিগত দিক থেকে এনজিও ও তাদের দাতাদের অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য এনজিওর মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীরা একটি সর্বাত্মক 'প্রেসার গ্রুপ' বা চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রকারান্তরে রাজনীতিতে প্রভাব ও হস্তক্ষেপ বিস্তৃত করছে এবং এনজিওদের রাজনীতি-নিরপেক্ষ থাকার মৌলিক শর্তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করছে।

www.bjilibrary.com

বিশ্বব্যাপী বামপন্থী-কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার সঙ্গে এনজিও বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধির একটি যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। এ সূত্রেই আমরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা দেশের এনজিওগুলোতে বামপন্থী ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ লক্ষ্য করি। এবং সেই সূত্রে এনজিওগুলোকে বিরাজনীতিকরণ বা অতি রাজনীতিকরণের অধীনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে থাকি।

In a large part this failure is due to the success of the NGOs in displacing and destroying the organized leftist movements and co-opting their intellectual strategies and organizational leaders. (বিস্তারিত দেখুন): [James Petras]

বাংলাদেশে এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো মস্কোপন্থী 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র শক্তিশালী অঙ্গ সংগঠন 'বাংলাদেশ ক্ষেত মজুর সমিতি' নিজেই BAWPA (Bangladesh Agricultural Working Peoples Association) নামে একটি এনজিওতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এর পেছনে কাজ করছে তিনটি কারণ। যেমন :

১. এনজিও কর্তৃক বাম আন্দোলনের শক্তিকে আত্মস্থ করে শক্তিশালী হওয়ার প্রচেষ্টা;

২. এনজিওদের ভেতরে মিলেমিশে কাজ করবার বামপন্থী কমিউনিস্টদের কৌশলগত অবস্থান; এবং

৩. ধর্মনিরপেক্ষতা, ভোগবাদ, বামপন্থী আদর্শের বিকাশ সাধন।

অতএব, বাংলাদেশের এনজিও দেশজ দিক থেকে যাদেরকে পাচ্ছে এবং বিদেশ থেকে যাদের সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে, তারা কেউই রাজনীতি নিরপেক্ষ নন। এরা মূলতঃ কয়েকটি ব্যাপারে একমত। আর তা হলো:

সাবেক কমিউনিস্ট সংশ্লিষ্টতা;

পশ্চিমা পুঁজিবাদী পৃষ্ঠপোষকতা;

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচার;

খ্রিস্টকরণকে উৎসাহিতকরণ;

উদার-খোলামেলা-মুক্ত-ভোগবাদী জীবন ও সংস্কৃতির চর্চা ও অনুসরণ; এবং

সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামের বিকাশকে বাধা প্রদান।

তবে, সকল এনজিওই যে উপরের প্রবণতার আওতায় পড়বে, এমন নয়। বেশ কিছু এনজিও এমনও আছে, যারা নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষভাবে নিজস্ব উন্নয়ন কাজে লিপ্ত। তবে দাতা ও সংশ্লিষ্টদের চাপে তাদের পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ থাকা কতটুকু সম্ভব হয়, সেটা অবশ্য বিতর্ক সাপেক্ষ ব্যাপার।

সাত.

বাংলাদেশে বর্তমানে এনজিওদের ক্ষেত্রে যে সকল প্রবণতা লক্ষ্যণীয়, তা হলো:

এনজিওদের জন্ম, বিকাশ ও বিস্তার বাহ্যত অরাজনৈতিক বলে দাবি করা হলেও

www.bjilibrary.com

কার্যক্ষেত্রে এনজিওরা বহু রাজনৈতিক কর্মকারে সঙ্গে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে।

এনজিওদের তহবিল প্রদানকারী দেশী-বিদেশী গোষ্ঠীসমূহ একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই অর্থের যোগান দেয়।

এনজিওরাও স্বভাবতই তহবিলদাতাদের রাজনৈতিক-আদর্শিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে কাজ করে।

তহবিলের পাশাপাশি কৌশল বা তত্ত্ব দান করে দাতারা এনজিওদের মাধ্যমে প্রচলিত প্রথা-প্রতিষ্ঠান-মূল্যবোধ-জীবনাচার-বিশ্বাস-ধর্ম-সংস্কৃতিকে কলুষিত বা ক্ষেত্র বিশেষে চিরায়ত ঐতিহ্যের বিপরীতে দাঁড় করাচ্ছে।

খুব কম এনজিওই দাতাদের ইচ্ছার বাইরে স্বাধীনভাবে এবং দেশজ প্রয়োজন বা আশা-আকাঙ্খার নিরিখে কাজ করতে পারে।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও রাষ্ট্রসমূহ এনজিওদের প্রদেয় তহবিলের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় খাতকে সংকুচিত করে বিরাষ্ট্রীয়করণকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগকে শক্তি যোগাচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় খাতকে ক্রমশঃ সংকোচন তথা রাষ্ট্রকে দুর্বল করার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করার ঘটনাও ঘটছে।

সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনাকে ভোঁতা করে এবং রাজনীতিতে অরাজনৈতিক উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এক ধরনের আপোসকামী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটানো এনজিওদের রাজনৈতিক এজেন্ডার অন্যতম বিষয় বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পশ্চিমা তহবিল, কৌশল ও তত্ত্বদাতাদের প্ররোচনায় এনজিওরা মানুষকে রাজনীতি বিমুখ ও আদর্শবিযুক্ত করছে।

ইসলামের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আনুগত্যকে খুবই সুপ্তভাবে বিনষ্ট করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ও করণীয় নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। যেমনঃ

এনজিওদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যাবে না।

এনজিওদের উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, যেমনঃ বই, পত্রিকা, পাঠ্য বিষয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং ঘোষিত জাতীয় আদর্শ, চেতনা, ধর্ম, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অনুসারী হতে হবে।

দাতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের আগে সরকারের কাছ থেকে এনজিওদের অনুমতি নিতে হবে।

বিদেশি সাহায্য কিভাবে ব্যয় হবে সে সম্পর্কে এনজিওদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এবং এদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

www.bjilibrary.com

ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ বা সুদ আদায় বন্ধ করতে হবে।

এনজিওদের কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন [টিএনও, ডিসি, চেয়ারম্যান, মেম্বার] অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এনজিওদের টার্গেট গ্রুপ তথা সদস্যদের মধ্যে জাতীয় চেতনা, বিশ্বাস, ধর্ম, সংস্কৃতির শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে জাতি গঠন ও জাতীয় ঐক্যবোধ সুদৃঢ়করণের কাঠামোগত-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জাতীয় চেতনা, বিশ্বাস, ধর্ম, সংস্কৃতির শিক্ষার বিপরীতে অন্য কোন মতবাদ বা মতাদর্শ প্রচার-প্রসার-সঞ্চার-বিকাশের যেকোন ধরনের উদ্যোগকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এনজিওদের সকল আর্থিক, প্রশাসনিক, আদর্শিকসহ সব ধরনের কার্যক্রমকে নিয়মিত অডিট ও পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে।

এনজিও এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কার্যক্রম বা মনোভাবের রাজনৈতিকীকরণের অভিযোগ পাওয়া গেলে এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন প্রদানের পূর্বেই সংশ্লিষ্টদের পূর্বাপর রাজনৈতিক-সাংগঠনিক অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত করতে হবে।

সম্পূর্ণভাবে পেশাদারিত্বের মনোভাবাপন্ন একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত উন্নয়ন কর্মীদের মাধ্যমে এনজিও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো নিরপেক্ষ নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগ কার্য সম্পন্ন করে দলীয় লোক ও আত্মীয়-স্বজনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সকল পথ ও পন্থা বন্ধ করতে হবে।

এনজিওদের ভেতরে কোন অনিয়ম হলে বা কোন রাজনৈতিক-আদর্শিক পক্ষপাতমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

টার্গেট গ্রুপ বা সদস্যদের কোন সুবিচার প্রার্থনা বা অভিযোগ তদন্ত ও সুরাহা করার জন্য নিরপেক্ষ সংস্থা গঠন করতে হবে।

এজিওদের কার্যক্রম, প্রশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বেতন-ভাতা, পরিচালনার নানা দিক একটি সরকারি নীতিমালার অধীনে আনতে হবে।

এনজিওদের সম্পত্তির ব্যবহার, হস্তান্তর, বিক্রয়, ব্যবহার ও মালিকানার ব্যাপারে সরকারকে নজর রাখতে হবে।

এনজিওদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

এনজিও এবং এর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িতদের করের আওতায় আনতে হবে।

এনজিওসমূহকে উন্নয়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ আইন ও নিয়ম-নীতির অধীনে তাদের কাজের সীমা ও গণ্ডির ভেতরে তৎপর রাখাই কর্তব্য। তাদের পক্ষে রাজনীতিতে কোনরূপ

www.bjilibrary.com

অংশগ্রহণ তাদের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, গ্রহণযোগ্যতা, আস্থা ও সমর্থনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত করবে। রাজনীতিবিদগণও ক্ষুদ্র ও দলীয় স্বার্থে তাদেরকে কাছে এনে নিজের কাজে লাগিয়ে ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। ক্ষমতাসীনদের উচিত এ কারণে এনজিওকে অবিশ্বাস করা যে, তারা সরকারের অর্জিত সাফল্য থেকে জনগণ ও দাতাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেয় এবং নিজেদেরকে সরকারের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ও কর্মক্ষম বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোরও উচিত এনজিও থেকে সতর্ক থাকা। কারণ, এনজিওরা 'সদস্য সংগঠন' বা 'মেম্বারশিপ অর্গানাইজেশন' না হয়েও রাজনৈতিক দলসমূহের মতো জনসমর্থন আশা করে এবং তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মীদেরকে বেতনভোগী কর্মচারি হিসাবে নিয়োগ দেয়। এভাবে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের সংঘবদ্ধ কার্যক্রম থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাজনৈতিক দলগুলোই। সর্বোপরি দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে সচেতন নাগরিকের কর্তব্য হলো বিদেশি অর্থ ও নীতি-আদর্শের অনুসারী এনজিওদের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত নজর রাখা, যাতে এনজিওসমূহ দেশ ও মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, আদর্শ, চেতনা ও জাতীয়তার বিরুদ্ধে কোনরূপ অপতৎপরতা নিতে না পারে। জনগণ এনজিওকে রাজনীতি-সম্পৃক্ত হতে যেমন দেবে না বরং বাধা দেবে; তেমনই এনজিও কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমানার মধ্যে রাখার জন্য সরকারকে চাপ দেবে। উন্নয়নের জন্যে সংগঠন থাকবে প্রকৃত উন্নয়ন-কর্মীদের হাতে; বিশেষ কোন আদর্শ বা দলের অনুগামী ছদ্ম রাজনীতিকদের হাতে নয়। রাজনীতি ও এনজিওর মধ্যকার বেশি মাখামাখি হলে রাজনীতির যেমন ক্ষতি হবে, এনজিওদেরও তেমনই ক্ষতি হবে। অতএব এ ব্যাপারে রাজনীতিবিদ ও এনজিওদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন; প্রয়োজন জনগণেরও সচেতন থাকা।■

লেখক-পরিচিতি : ড. মাহফুজ পারভেজ– কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১০ই মার্চ, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.bjilibrary.com

গ্রামীণ ব্যাংক ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

■

গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ভূমিহীন বিশেষ করে মহিলাদের সহজ শর্তে ঋণ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত একটি বিশেষ ব্যাংক। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুছ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা এলাকাকে কেন্দ্র করে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে সর্বপ্রথম এই ব্যাংকের কাজ শুরু করেন। প্রথম দিকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জোবরা শাখা Designated Grameen Bank হিসেবে কাজ করলেও পরবর্তীকালে প্রকল্পটির আশাব্যঞ্জক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এই প্রকল্পকে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি তহবিল [International Fund for Agriculture] এই প্রকল্পকে ঋণ দানের জন্য এগিয়ে আসে। ১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলী গত তিন দশকে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা পেতে সক্ষম হয়। দেশ বিদেশের সমাজবিদ-অর্থনীতিবিদরা তার সমালোচনা ও প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং আন্তর্জাতিক অংগনে ব্যাংকটির সুহৃদদের একাগ্র প্রচেষ্টায় ২০০৬ সালে এই ব্যাংক ও তার প্রতিষ্ঠাতা

www.bjilibrary.com

ড. মুহাম্মদ ইউনুছ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। এই পুরস্কার বাংলাদেশের জন্য এক দুর্লভ সম্মান বয়ে আনে। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এই পুরস্কারের লেজ ধরে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ইউনুছ একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন। রাজনীতির নিষিদ্ধ অঙ্গনে তাঁর উন্মুক্ত রাজনীতি এবং দল গঠনের ঘোষণা বোদ্ধা মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাইকারী হারে তিনি দেশের সকল রাজনীতিককে অর্থলিপসু বলে আখ্যায়িত করায় ইতোপূর্বে সকল মহলে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি দল ঘোষণা করায় এই অসন্তোষ নতুন গতি পায়। কেউ কেউ রাজনীতিতে তাঁর এই আগমনকে সরকারী আশির্বাদে ইন্দো-মার্কিন পরাশক্তির পরিকল্পিত অভিযান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আওয়ামী লীগ নেত্রী একে সুদখোরের আবির্ভাব বলে ঘোষণা করেন। বক্ষমান নিবন্ধে আমি একটি অর্থ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচয়, তার কার্যাবলী ও কর্ম পদ্ধতি, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সাফল্য ব্যর্থতা, ব্যয় সাশ্রয়তা, সুদের হার, ঋণ দান ও আদায়ের অবস্থা এবং গ্রাহক সদস্যদের অবস্থা সীমিত আকারে আলোচনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো।

আগেই বলা হয়েছে যে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলা, যাদের বসত ভিটাসহ অন্যূন আধা একর জমি আছে অথবা যাদের অস্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্য পাড়া গাঁয়ের এক একর জমির মূল্যের বেশী হবে না তারাই এর সদস্য হতে পারেন। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ জামানত মুক্ত। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনুছের মতে, গ্রামের অধিকাংশ কৃষক পরিবারের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ এতই কম যে তাদের আয় থেকে পরিবারের ভরণপোষণ চালানো খুবই কঠিন ব্যাপার। এমতাবস্থায় তারা যদি ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা পায় তা হলে কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে সার্থকভাবে তা ব্যবহার করতে পারে এবং সময়মত এ ঋণ পরিশোধও করতে পারে। পুঁজির অভাবই তাদের জন্য বড় অভাব; কাজেই গ্রামীণ ব্যাংক মনে করে যে পুঁজি দিয়ে তাদের সাহায্য করা হলে পল্লী এলাকার দরিদ্র মানুষরা কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণসহ গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী পালনের ন্যায় আত্ম কর্মসংস্থানমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করতে পারে। এই ব্যাংক আরো মনে করে যে, গরীবদের যদি ঋণ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে উপার্জন বৃদ্ধির জন্য কি করতে হবে বিচার বিবেচনা করে তারা তা নিজেরাই নির্ণয় করতে পারে এবং কর্মসংস্থানের উপযোগী অপরিহার্য উপায় উপকরণ স্বয়ং ক্রয় করে তা ব্যবহার করতে পারে। এই ধারণাগুলোকে ভিত্তি করে গ্রামীণ ব্যাংক পল্লী এলাকার পুরুষ ও মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের নিজ নিজ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত কাজ চিহ্নিত করতে সহায়তা করে এবং গ্রুপ সদস্যদের পরস্পর পরস্পরের জন্য জামিন হতে উদ্বুদ্ধ করে।

www.bjilibrary.com

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ

ক) বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের জামানত বিহীন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান।

খ) গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ থেকে দরিদ্র মানুষকে মুক্ত করা।

গ) ব্যাপক বেকার জনশক্তির জন্য আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংগঠিত করা যা তারা বুঝতে এবং পরিচালনা করতে পারে এবং

ঙ) স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয় ও স্বল্প বিনিয়োগ ভিত্তিক বহু পুরাতন দুষ্টচক্রকে ভেঙ্গে দিয়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন ঋণ, নতুন বিনিয়োগ এবং অধিক আয় ভিত্তিক একটি বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা।

গ্রামীণের ঋণ ডেলিভারী মডেল

পল্লী দরিদ্রদের সহায়তা করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক একটি সমন্বিত মডেল উদ্ভাবন করেছে। এই মডেল অনুযায়ী পল্লীর সংজ্ঞায়িত দরিদ্ররা ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পাঁচ জনের একটি করে গ্রুপ গঠন করে। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে সামনে রেখে পুরুষ ও মহিলারা আলাদা আলাদা গ্রুপ গঠন করেন। গ্রুপ সদস্য হবার জন্য কতগুলো শর্ত পালন করতে হয়। তাদের একই গ্রামের বাসিন্দা হতে হয়। তারা একই পরিবারভুক্ত হতে পারেন না। তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশী হতে পারে না। তারা অবশ্যই অভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন হবেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজন হবেন। প্রত্যেক গ্রুপ বা দলে একজন চেয়ারম্যান ও একজন সেক্রেটারী থাকেন। সদস্যরা তাদের নির্বাচিত করেন। গ্রুপ চেয়ারম্যান দলীয় শৃঙ্খলার জন্য দায়ী থাকেন। এক বছর পর পর চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী পরিবর্তিত হন। অফিস বিয়ারারদের পুনর্নির্বাচনের আগে প্রত্যেক সদস্য কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচিত হবার সুযোগ পান। সাপ্তাহিক বৈঠক গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়মিত শৃঙ্খলার অংগ। এই বৈঠকে সদস্যরা গ্রামীণ ব্যাংকের শৃঙ্খলা, বিধি বিধান, নিয়ম পদ্ধতি এবং গ্রুপ কার্যাবলী শেখেন এবং আলোচনা পর্যালোচনা করেন। বলা বাহুল্য গ্রামীণ ব্যাংকের একজন সদস্যকে গ্রুপ বা দল ভুক্তির প্রাক্কালে ১৬ দফা শপথনামা পাঠ করতে হয়। এই শপথনামা বাস্তবায়নের বিষয়টিও সাপ্তাহিক সভায় আলোচনা হয়। শপথাধীন ১৬ দফা সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

১। শৃঙ্খলা, একতা, সাহসিকতা ও কঠোর পরিশ্রম- গ্রামীণ ব্যাংকের এই চারটি নীতি আমরা আমাদের জীবনের সর্বস্তরে মেনে চলবো এবং এগিয়ে নেবো।

২। আমরা আমাদের পরিবারে সমৃদ্ধি আনবো।

৩। আমরা ভাঙ্গা ঘরে থাকবো না, আমরা পুরাতন ঘর মেরামত করবো এবং নতুন ঘর নির্মাণ করবো।

www.bjilibrary.com

৪। আমরা সারা বছর সব্জির চাষ করবো, পর্যাপ্ত সব্জি খাবো এবং অতিরিক্ত সব্জি বিক্রি করবো।

৫। বৃক্ষ রোপনের মওসুমে আমরা যত বেশী সম্ভব চারা লাগাবো।

৬। আমরা পরিকল্পিতভাবে পরিবারকে ছোট রাখবো, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবো এবং স্বাস্থ্যের যত্ন নেব।

৭। আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবো এবং তাদের পড়া লেখার খরচের নিশ্চয়তা দেব।

৮। আমরা আমাদের ছেলে মেয়ে এবং আশে পাশের পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো।

৯। আমরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি ও ব্যবহার করবো।

১০। আমরা নলকূপের পানি পান করবো, যদি তা পাওয়া না যায় তাহলে পানি ফুটিয়ে কিংবা ফিটকারি দিয়ে বিশুদ্ধ করে খাবো।

১১। আমরা ছেলেদের বিয়েতে যৌতুক নেব না, মেয়েদের বিয়েতে যৌতুক দেব না। আমরা আমাদের কেন্দ্রকে যৌতুকের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখবো এবং বাল্যবিবাহ রোধ করবো।

১২। আমরা কারুর প্রতি অবিচার করবো না এবং আমাদের উপরও কাউকে অবিচার করতে দেব না।

১৩। বেশী আয়ের লক্ষ্যে আমরা যৌথভাবে বড় অংকের ঋণ গ্রহণ ও বিনিয়োগ করবো।

১৪। আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য তৈরি থাকবো। যদি কেউ বিপদে পড়ে তা হলে সকলে মিলে তাকে সাহায্য করবো।

১৫। কোনও কেন্দ্রে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনও খবর পেলে আমরা সকলে মিলে তা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবো।

১৬। আমাদের কেন্দ্রগুলোতে আমরা শারীরিক ব্যায়ামের প্রচলন করবো এবং সকলে মিলে সামাজিক কাজ কর্মে অংশ নেব।

উপরোক্ত ১৬ দফা শপথ গ্রামীণ সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক। গ্রুপ গঠনের ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক এর একজন কর্মচারী সদস্যদের শপথ পরিচালনা করেন এবং গ্রুপ বৈঠকে এর পুনরাবৃত্তি একটি প্রভাতী অনুশীলন হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে তারা নিয়মানুযায়ী সঞ্চয় জমা দেন এবং তাদের গ্রুপ শৃঙ্খলা অনুসরণের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় গ্রুপের দু'জন সদস্যকে ঋণ দেয়া হয় এবং এক থেকে দু'মাস পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। যদি তারা নিয়মিত সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন এবং দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলেন তাহলে পরবর্তী দু'জনকে নতুন ঋণ মঞ্জুর করা হয়। দলনেতা সবার শেষে ঋণ নেন। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের আকার ক্ষুদ্র, সাধারণত দুই

www.bjilibrary.com

থেকে পাঁচ হাজার টাকা, সর্বোচ্চ সীমা ১০,০০০/= টাকা এবং সাপ্তাহিক কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে পরিশোধ যোগ্য। যদি কোনো সদস্য কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে দলীয়ভাবে সকল সদস্য নতুন ঋণের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়েন। এই বিধি নিয়মিত ঋণ পরিশোধে গ্রুপ সদস্যদের পরস্পরের উপর পরস্পরের চাপ সৃষ্টিতে বাধ্য করে। এখানে যদিও গ্রুপ সদস্যদের এককভাবে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে তবুও দল যৌথভাবে এই ঋণ পরিশোধে দায়বদ্ধ থাকে। আর্থিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব তাদের।

ঋণ কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সদস্যের নিজের; এ ব্যাপারে তারা পরস্পর পরস্পরের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করার কথা। পাঁচ থেকে আটটি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। গ্রুপ এবং কেন্দ্রের সভায় কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করণের বিষয়টি আলোচনা হয়। কেন্দ্রে একজন সভাপতি ও একজন সেক্রেটারী থাকেন। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারীরা কেন্দ্র পরিচালনায় সহায়তা করে থাকেন। একজন কর্মচারীর তদারকীতে একাধিক কেন্দ্র থাকে। গ্রুপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয় এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে কেন্দ্র ও গ্রুপ সভায় গ্রামীণ কর্মচারীরা উপস্থিত থাকেন। বলাবাহুল্য এতে গ্রুপ সদস্যদের উপস্থিতিও বাধ্যতামূলক। কেন্দ্রের/গ্রুপের সভাপতি সভা পরিচালনা করেন, হাজিরা নেন, শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন এবং সাপ্তাহিক কিস্তি ও সঞ্চয়ের অর্থ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত কর্মকর্তারা তাদের কাজকর্মের জন্য কোনো প্রকার পারিশ্রমিক পান না।

সঞ্চয়কে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ বলে মনে করে যা অধিকাংশ উন্নয়ন অর্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের বেলায় প্রযোজ্য নয়। প্রত্যেক সদস্য কমপক্ষে সপ্তাহে এক টাকা সঞ্চয় করে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা দিতে হয়। আবার ঋণ গ্রহীতাদের তাদের ঋণের পাঁচ শতাংশ গ্রুপ তহবিলেও জমা রাখতে হয়। এছাড়াও তাকে ঋণের উপর দেয় মোট সুদের এক চতুর্থাংশ জরুরী তহবিলে প্রদান করতে হতো। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে এই বাধ্যবাধকতা কিছুটা শিথিল করা হয়েছে; এখন এক হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের উপর Emergency Levy নেই। এর অধিক ঋণের উপর তাদের প্রতি হাজারে ৫ টাকা প্রদান করতে হয়। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ১০০ টাকার একটি ইকুইটি শেয়ার ক্রয় করতে হয়। গ্রুপ ও জরুরী তহবিলের অর্থ সদস্যদের সাধারণ কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। আবার যখন কোনো সদস্য ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হন তখন এই তহবিলের অর্থ থেকেও তা পরিশোধ করা হয়। শেয়ারের টাকাসহ গ্রুপ তহবিল এবং জরুরী তহবিল বা বীমার টাকা ঋণ থেকে কেটে নেয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে যে, এসব তহবিল বাদ দিয়ে পাঁচ হাজার টাকার একজন ঋণ গ্রহীতা নগদ ৪২০০ থেকে ৪২৫০.০০ টাকা হাতে পান এবং এক বছরে কিস্তির

www.bjilibrary.com

ভিত্তিতে ৫০০০ টাকা ও তার উপর দেয় সুদ পরিশোধ করতে হয়। কারুর যদি কোনো কারণে কিস্তি খেলাপী হয় তা হলে সামাজিকভাবে তাকে নানা গঞ্জনা সইতে হয়।

বলা হয়ে থাকে যে, ঋণের জন্য মানুষকে ব্যাংকে যেতে বাধ্য করার পরিবর্তে গ্রামীণ ব্যাংক নিজেই দরিদ্র মানুষের দুয়ারে গিয়ে হাজির হয়। দল গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণের দরখাস্ত গ্রহণ ও অনুমোদন, ঋণ বিতরণ, তদারক ও পরিশোধ গ্রামীণ ব্যাংকের দাদন প্রক্রিয়ার অংশ। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তদারক ও পরিধারণকে গ্রামীণ পদ্ধতি উৎসাহিত করে।

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী

গ্রামীণ ব্যাংকের নেতৃবৃন্দ শুরুতেই ধরে নিয়েছিলেন যে ঋণ আদায়ের উচ্চ হার এবং আর্থিক ভিত মজবুত হবার পাশাপাশি ঋণ গ্রহীতাদের কিছু সামাজিক সুযোগ সুবিধাও পাওয়া উচিত। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গ্রামীণ ব্যাংক একটি সমন্বিত সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে যা তার ১৬ দফা শপথের মধ্যে বিবৃত হয়েছে। পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও আর্থিক শৃঙ্খলার অনুশীলনকে নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য। তাদের শপথে বিবৃত সিদ্ধান্তসমূহকে সদস্যদের কাজ কর্মের দিক নির্দেশক এবং সামগ্রিকভাবে তাদের আচরণ বিধিও (Code of Conduct) বলা হয়ে থাকে। যেমন এই ব্যাংক তার সদস্যদের গাছ লাগানো, বসত ঘরের আশ পাশে সব্জির চাষ, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঘর নির্মাণ এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে যা পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সহায়ক। ব্যাংকের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিশু পরিচর্যার উপর প্রদত্ত প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মহিলারাই হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের মুখ্য টার্গেট। সামাজিক উন্নয়নে তাদের অংশ গ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ব্যাংকটি গ্রামীণ মহিলাদের আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতার পূর্বে সমবায় সমিতিসমূহ এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও কৃষি উন্নয়ন ফাইন্যান্স কর্পোরেশনই (স্বাধীনতা উত্তর কালে কৃষি ব্যাংক হিসেবে পুনর্গঠিত) ছিল পল্লী অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রধান উৎস। তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান (বর্তমানে সোনালী ব্যাংক) তুলা ও পাট চাষীদের ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য মুখ্যতঃ প্রতিষ্ঠীত হলেও কালক্রমে Treasury Function-ই তার মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল যে সমবায় সমিতিসমূহ মূলধন সমস্যায় জর্জরিত, জাতীয় সমবায় ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকসমূহের কাছে বিনিয়োগ করার মত কোন অর্থ ছিল না। কৃষকদের ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য তৎকালীন সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি) ১৯৭২ সালে কৃষি ব্যাংকের সাথে চুক্তি করেছিল। কিন্তু ব্যাংকটি অর্থ সরবরাহে ব্যর্থ হয়। সোনালী ব্যাংকের কাছে তখন পাট ঋণের অব্যয়িত তিন কোটি

www.bjilibrary.com

টাকা ছিল। তারা এই অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসে এবং আইআরডিপি'র সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের আওতাধীন ৫৭টি থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রথমবারের মত পল্লী ঋণের সাথে সম্পৃক্ত হয়। ঐ সময়ে পল্লী এলাকায় কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ দিতো না। সমবায় সমিতি অথবা কৃষি ব্যাংকেও জামানত ছাড়া ঋণ দেয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৭৪-৭৫ সালের দুর্ভিক্ষে গ্রামের ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীরা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় আইআরডিপি'র তরফ থেকে দেশের ভূমিহীনদের সমবায় সমিতিতে সংগঠিত করে সরকারের অনুমোদন নিয়ে সীমিত আকারে জামানত বিহীন ঋণ চালু করলেও তা ছিল অত্যন্ত নগণ্য মাত্রার। ১৯৭৭ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচী (১০০ কোটি টাকার ঋণ নামে পরিচিত) চালু করা হলেও ভূমিহীন দরিদ্র মানুষেরা আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে এর সুযোগ পায়নি। এই প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগ ও কর্মসূচী জোবরা এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এই অগ্রযাত্রা পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয়তঃ সত্তরের দশক পর্যন্ত উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় মহিলারা ছিল অনুপস্থিত। ঐতিহাসিক কারণে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা সর্বদা দারিদ্র্যের প্রধান বলি হয়ে আসছিল। সরকারীভাবে প্রথমবারের ন্যায় আইআরডিপি'র মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে ১৯টি থানায় সমবায়ের মাধ্যমে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী চালু করা হয়। তখনো মহিলা অধিদফতর স্থাপিত হয়নি। গুটি কয়েক এনজিও মহিলাদের উন্নয়নমুখী করার জন্য যে তৎপরতা শুরু করেছিল তা বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। এ অবস্থায় গ্রামীণ পরিবারসমূহের আর্থিক সংকট নিরসনের ফলপ্রসূ পন্থা হিসেবে গ্রামীণ বাংক জামানত বিহীন ঋণ দানের বিষয়টিকে বেছে নেয় এবং সুবিধা ভোগীদের মধ্যে মহিলাদের প্রাধান্য দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ৯৪ শতাংশই হচ্ছে মহিলা। এই দু'টি বিষয়ই ছিল তৎকালীন বাংলাদেশে অবহেলিত বিষয়। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক জামানত ছাড়া ঋণের বিষয় চিন্তা করতে পারেনি। আবার মহিলাদের সামনে টেনে আনা এটাও ছিল বিরাট সাহসের ব্যাপার। এ প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ব্যাংকের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল এবং তারা দাতাসংস্থা ও আন্তর্জাতিক এজেন্সিগুলোকে সহজেই বুঝাতে সক্ষম হলো যে তারা innovative, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করছে। অবহেলিত মহিলাদের সাহায্য করছে। জামানতবিহীন ঋণের নতুন Concept তাদের মুগ্ধ করলো। যে দেশের মহিলারা স্বামী শ্বশুরের নাম উচ্চারণ করে না, পর্দা ছাড়া বাইরে বের হয় না তাদের যখন গ্রুপ সভায় আনা শুরু হলো তখন বিদেশীরা এর মধ্যে "নারী মুক্তির" উপকরণ খুঁজে পেলো এবং ব্যাংকটির জন্য আর্থিক সাহায্য সহজতর হয়ে উঠলো। নারীরা গ্রামীণ ব্যাংকের বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের Production Plan এ পরিণত হলেন। দেশ বিদেশে ব্যাংকটি প্রচুর পাবলিসিটি পেতে শুরু করে এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। পুরুষদের তুলনায় ব্যাংকটি মেয়েদের অধিকতর অনুগত মনে করে

www.bjilibrary.com

এবং বিশ্বাস করে যে তাদের ঋণ দেয়ার মধ্যে কোন ধরনের ঝুঁকি নেই। সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে ব্যাংকটি মহিলাদের অধিকার সচেতন হবার ব্যাপারে প্রশিক্ষণও প্রদান করে। নারী পুরুষ বৈষম্য, অধিকার আদায়ের পন্থা এবং পরিবারের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি সম্পর্কিত তাদের মটিভেশন কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়েও মহিলাদের অধিকতর তৎপর করে তোলে এবং তাদের কেউ কেউ স্বামী শ্বশুরের সংসারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশেও অস্বীকার করে বসে। নারীবাদীরা এর মধ্যে ক্ষমতায়নের উপাদান খুঁজে পান।

দারিদ্র্য বিমোচন মডেল

গ্রামীণ ব্যাংক পল্লীর শ্রমজীবী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণ ভিত্তিক একটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী চালু করেছে। বলা বাহুল্য পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলাদেশ গ্রামোন্নয়নের যে মডেল অনুসরণ করে আসছিল তা ছিল প্রবৃদ্ধি ভিত্তিক কৌশল মাত্র। এতে কৃষি খাতে উৎপাদন বাড়লেও ক্ষেতমজুরীর ন্যুনতম কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ কোনো সুবিধা পায়নি। প্রবৃদ্ধি বাড়লে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে এবং মধ্য বিত্ত উচ্চ বিত্তদের উন্নয়নের সুবিধা Trickle down করবে এ ধারণা সত্য প্রমাণিত না হওয়ায় সত্তরের দশকে তা পরিত্যাগ করার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। বিশেষজ্ঞরা বলতে থাকেন যে পল্লী এলাকার কৃষি খাতে যে ভর্তুকী দেয়া হচ্ছে তা কৃষি উৎপাদনের Capital intensive method-কে উৎসাহিত করে এবং Demand induced growth-কে নিরুৎসাহিত করে। এই প্রেক্ষিতে ঐ সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা Target Group Approach-কে বেছে নেয়। এই approach-এ ঋণ ছিল না। অনুদান এবং সেবা কার্যক্রম বিশেষ করে দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ ব্যাংক সরকারী বেসরকারী সংস্থাগুলোর এই কর্মসূচীকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করে। তাদের ধারণা, ঋণবহির্ভূত কর্মসূচী দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভবপর নয়। গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্বাস করে যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উপার্জন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গ্রামীণ মানুষের আশু প্রয়োজন হচ্ছে ঋণ। কাজেই গ্রামীণ ব্যাংক ঋণকেই দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান উপকরণ বলে মনে করে। ঋণের সাথে সামাজিক উপাদান ও আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা হলে দরিদ্র লোকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় বলে তারা মনে করে। গ্রামীণের এই মডেলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুরুষদের তুলনায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহিলাদের প্রাধান্য। মহিলাদের সম্মান ও সম্ভ্রমবোধ বেশী; কাজেই ঋণ গ্রহিতাদের মধ্যে মহিলাদের প্রাধান্য থাকলে ঋণ পরিশোধের হার বেশী হবে, এটাই তাদের অন্যতম দর্শন।

www.bjilibrary.com

আর্থিক মধ্যস্থতার ধরন

আর্থিক মধ্যস্থতার মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কামনা করে। নিজের Financial viability-র বিনিময়ে দরিদ্র মানুষকে এই ব্যাংক ঋণ দেয়ায় বিশ্বাসী নয়, তার ঋণ মডেলটি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে তার আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চিত হয়। ব্যাংকটির ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের পল্লী খাতে ঋণ ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হচ্ছে খেলাপী কালচার। Asymmetric information এবং Imperfect enforcement থেকে ঋণের বাজারে যে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দেখা দিয়েছে তা একটি সার্থক ও আর্থিক স্বয়ম্ভর ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এখানে ঋণ দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই উৎপাদন ঝুঁকিতে থাকেন। আবার ঋণ দাতারা মনে করেন যে এখানে তাদের অতিরিক্ত ঝুঁকিও রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনও কারণে উৎপাদন যদি ব্যাহত হয় তাহলে কৃষকরা ঋণ শোধ করতে পারে না। এতে তাদের উপর চক্রবৃদ্ধি সুদের বোঝা বাড়ে। পূর্ববর্তী ঋণ শোধ না করে পরবর্তী মওসুমের জন্য ঋণ পাওয়া তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার। ঋণ দানকারী সংস্থার উপর এর প্রভাবও নেতিবাচক। তারা পুরাতন ঋণ ফেরৎ না পেলে নতুন ঋণ দিতে পারেন না। ঋণ মাফ করে দিলে তহবিলের সংকট দেখা দেয়। তখন সরকারের কাছে ভর্তুকি প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

গ্রামীণ ব্যাংক কৃষির মত ঝুঁকিপূর্ণ খাতে ঋণ দেয়া থেকে বিরত থাকতে চায়। তারা অভিন্ন 'পটভূমি ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দলীয় তত্ত্বাবধানে ঋণ দিয়ে সমস্যা উত্তরণের চেষ্টা করেছে এবং কৃষি বহির্ভূত খাত থেকে সুবিধাভোগী সংগ্রহের সম্ভাব্যতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এখানে ব্যক্তি যখন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয় তখন সমষ্টির উপর তার দায়িত্ব এসে বর্তায়। এর ফলে সমষ্টি তার ঝুঁকি মুক্তির জন্য ব্যক্তিকে সব সময় চাপের মধ্যে রাখে এবং ব্যাংক কর্মীদের তদারকীর কঠোরতা ও নিবিড়তা যে কোন অবস্থায় কিস্তি পরিশোধে তাদের বাধ্য করে। এভাবে গ্রামীণ ব্যাংক তার ঋণ আদায়ের হারকে ৯০ শতাংশের উর্ধে তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে। ডিমাণ্ড ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এই হার ৪৫% - ৫০% এর মধ্যে। তদারক, পরিধারণ ও আদায়ের অধিকাংশ দায়িত্ব গ্রুপকে দেয়ায় ব্যাংকের পরিচালনা ব্যয়ও অনেক হ্রাস পেয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের সঞ্চয় কর্মসূচী সংকট কালে গ্রুপ সদস্যদের জন্য বীমার ভূমিকা পালন করে। দৈব দুর্বিপাক অথবা ঋণ পেতে বিলম্ব হলে তারা সঞ্চয় তুলে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে। গ্রুপ তহবিল ও দুস্থ সদস্যদের বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে কাজে লাগে। ঝুঁকি বীমার অনুপস্থিতিতে জরুরী তহবিল বিনিয়োগ দাতা ও গ্রহিতা উভয়ের স্বার্থে ব্যবহৃত হবার কথা।

www.bjilibrary.com

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা তাদের সঞ্চিত অর্থ থেকে এই ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করতে পারেন। বর্তমানে এর ইকুইটি শেয়ারে সদস্যদের অংশীদারিত্ব ৭৫ শতাংশের বেশী। মালিকানার সাথে সদস্যদের এই সম্পৃক্তি কর্জ পরিশোধ ও সঞ্চয় বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে বলে ব্যাংক মনে করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের দাবী অনুযায়ী তারা ঋণ সেবাকে বহুমুখী করেছে। স্বল্প সুদে মধ্য মেয়াদী গৃহ নির্মাণ ঋণ নিয়ে তার অনেক মহিলা সদস্যা ঘরবাড়ী তৈরি করেছে। আগে তারা স্বামীর তৈরি ঘরে থাকতো। এখন ঘরকে তারা গর্বকরে নিজের ঘর বলে দাবী করতে পারে যা গ্রামীণ পরিবেশে ইতোপূর্বে কল্পনা করা যেতো না। অনুরূপভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাময়িকভাবে আদায় তৎপরতা স্থগিত করে এবং কিস্তি পুনঃ তফসীলিকরণের মাধ্যমে ব্যাংকটি তার সদস্যদের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করে। ব্যাংকের ক্রম বর্ধিষ্ণু সম্পদ-ভিত্তি ও সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদী পারিবারিক ঋণ চালু করা হয়েছে। এই ঋণ দিয়ে পরিবারের সদস্যরা যে কোন রকমের আয় বর্ধক কর্মকাণ্ড শুরু করতে পারে। আবার ষোল দফা শপথকে সামনে রেখে গৃহ উন্নয়ন ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক কেন্দ্র ভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সদস্যদের ছেলে মেয়েদের জন্য পড়া লেখার ব্যবস্থা করছে, পারিবারিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে এবং নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা প্রভৃতি সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। ব্যাংকের মতে সমাজের কুপ্রথাগুলো যদি দূর করা না হয় তাহলে ঋণ নিয়ে মানুষ উৎপাদন মূলক কাজে ব্যবহার করবে না। বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের ন্যায় অপচয়মূলক কাজে ব্যবহার করবে। এতে Borrower দের Viability নষ্ট হবে, তারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। ফলে অর্থ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংকও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ তার টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীল মক্কেলের প্রয়োজন।

গ্রামীণ ব্যাংক সামাজিক পরিবর্তনও চায়। সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব এবং সমাজ পরিবর্তনে তাদের ভূমিকাকে সামনে রেখেই গ্রামীণ ব্যাংক তার মক্কেল হিসেবে মা'দের টার্গেট করেছে। এর ফলাফল ইতোমধ্যে সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টিকেও তারা বিবেচনায় রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য মহিলাদের প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টিকে গ্রামীণ ব্যাংক Equity motivated Scheme বলে দাবী করলেও গ্রুপ সদস্যদের দরকষাকষির অসম ক্ষমতা সত্যিকার অর্থে এ ব্যবস্থাকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে কিনা কিংবা পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের প্রাধান্য পারিবারিক ভারসাম্য নষ্ট করে অধিকতর সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও দারিদ্র্যের দিকে পরিবারকে ঠেলে দেয় কিনা তা গবেষণার বিষয় বলে অনেকে মনে করেন।

www.bjilibrary.com

কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও সংগঠন

গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে তার নতুন ধারণা ও মডেলের কারণে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে। আগেই বলেছি ব্যাংকটি ও তার প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুছ ২০০৬ সালে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাংলাদেশের মুখ উজ্জল করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের দাবী অনুযায়ী এই ব্যাংকের মডেল ও কার্যক্রম এখন আর বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সীমানা ডিঙ্গিয়ে বিশ্বের ৬৪টি দেশে এর কাজ সম্প্রসারিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, নেপাল, তাঞ্জানিয়া, ইথিওপিয়া, সেনেগাল, সামওয়া, আলসালভেদর, ক্যামেরুন, গণচীন, মালয়েশিয়া, বলিভিয়া, উগাণ্ডা, ভিয়েতনাম, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে গ্রামীণ ট্রাস্ট ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার সদস্যকে ২১ কোটি ৩৭ লক্ষ ডলার ঋণ প্রদান করেছে। এছাড়াও ট্রাস্টের পক্ষ থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুকরণে গৃহিত ৫৬৫৮৩টি নতুন প্রকল্পের অনুকুলে ২০০১ সালে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই তথ্যানুযায়ী ফিলিপাইনে গ্রামীণ ব্যাংকের ২৬/২৭ লক্ষ সদস্য রয়েছেন এবং এরা সে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ১৩০০ থেকে ১৩৫০টি কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত। এদের বিলিকৃত ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ ডলারের সমপরিমাণ পেসো। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জুন, ২০০১)

গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার

গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবী অনুযায়ী এই ব্যাংকে পাঁচ ধরনের ঋণ কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে এবং তাদের সুদের হার নিম্নরূপ ঃ

ক) সহজ ঋণ ঃ শতকরা ২০ টাকা। এক্ষেত্রে ক্রম হ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতি (Declining Balance system) অনুসরণ করে সুদ নির্ণয়ের ফলে এই হার প্রকৃত পক্ষে ১০% এ এসে দাঁড়ায়।

খ) গৃহ নির্মাণ ঋণ ঃ শতকরা ৮ টাকা। এই সুদও ক্রম হ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয় যা কার্যতঃ ৪% এ নেমে আসে। এই ঋণের অধীনে ৭ লক্ষ মহিলা ঘর নির্মাণ করেছেন।

গ) উচ্চ শিক্ষা ঋণ ঃ শিক্ষা চলাকালীন সময়ে সুদ মুক্ত। লেখা পড়া শেষ হবার পর ৫% হারে সার্ভিস চার্জ।

ঘ) ভিক্ষুকদের জন্য ঋণ ঃ সুদ মুক্ত। ৮৫ হাজার ভিখারী এই ঋণ সুবিধা পাচ্ছে।

ঙ) কেন্দ্র নির্মাণ ঋণ ঃ সুদ মুক্ত।

www.bjilibrary.com

দেশের ৬৪টি জিলায় গ্রামীণ ব্যাংকের ২৩১৭টি শাখা আছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এসব শাখায় সঞ্চিত আমানতের পরিমাণ হচ্ছে ৪৫১১ কোটি টাকা যার মধ্যে ব্যাংকের ৬৮ লক্ষ সদস্যের আমানতের পরিমাণ ২৭৫১ কোটি টাকা। ব্যাংকটির ঋণ গ্রহিতাদের ৯৭ শতাংশই মহিলা। গ্রামীণ ব্যাংক সাধারণত কৃষি মৎস্য, পশু সম্পদ, হাঁস মুরগী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাঁশ বেতের কাজ, স্বাস্থ্য শিক্ষা, গৃহনির্মাণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, রিক্সা ও ভ্যান ক্রয় প্রভৃতি খাতে ঋণ দিয়ে থাকে। এসব খাতে এ পর্যন্ত প্রদত্ত তাদের পুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২২৬৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশী ঋণ প্রদান করা হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে ৯১৪১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা, যা মোট ঋণের ৪০.৬১ শতাংশ। পশু সম্পদ ও পোলট্রি খাতে দেয়া হয়েছে ৩১৮১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা (১৪.০৬ শতাংশ), কৃষি খাতে বিতরণ হয়েছে ২৩২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা (১০.২৫ শতাংশ)। অবশিষ্ট ৩৫.০৮ শতাংশ ঋণ দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, হাউজিং, কুটির শিল্প ও ট্রেডিং খাতে। বিনিয়োগকৃত উপরোক্ত অর্থের মধ্যে অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ ৭৯২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ গ্রামীণ সদস্যদের মাথাপিছু ৪০৪৬ টাকা আমানতের বিপরীতে দায়ের পরিমাণ হচ্ছে ১১৬৫৪ টাকা (প্রায় তিন গুণ)।

অর্থায়ন ও প্রশাসনিক কাঠামো

নিজস্ব উৎসের পর্যাপ্ত তহবিলের অনুপস্থিতিতে শুরু থেকেই গ্রামীণ ব্যাংককে দেশ বিদেশের অনুদান ভর্তুকী এবং উন্নয়ন ঋণের উপর নির্ভর করে চলতে হয়েছে। প্রথম দিকে গ্রামীণ ব্যাংক তহবিলের বেশীর ভাগই এসেছে ইফাদ (International Fund for Agriculture Development) থেকে ৩% সুদে। একই হারে বাংলাদেশ ব্যাংকও তাদের Matching Fund দিয়েছে, যদিও পরবর্তীকালে এই সুদের হার ৫.৫% থেকে ৬.৫% এ উঠানামা করেছে। এছাড়াও প্রাথমিক বছরসমূহে গ্রামীণ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকেও ঋণ নিয়েছে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা বিশেষ করে নোরাড, সুইডিশ সিডা, ফোর্ড ফাউন্ডেশন ব্যাপকভাবে এবং সহজ শর্তে গ্রামীণ ব্যাংককে অর্থ সরবরাহ করতে থাকে। এর ফলে ব্যাংকটি খুব সহজে দেশব্যাপী তার নেটওয়ার্ক ও ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণে সক্ষম হয়।

এই ব্যাংকের শতকরা ২৫ ভাগ শেয়ার সরকারী মালিকানাধীন; ব্যাংকের তরফ থেকে এই পরিমাণ ৫% এ নামিয়ে আনার একটি প্রস্তাব ইতোমধ্যে সরকারকে দেয়া হয়েছে। এর প্রশাসন চারটি স্তরে বিভক্ত, সদর কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং ব্রাঞ্চ। আঞ্চলিক কার্যালয় ও এরিয়া অফিসকে সম্মিলিতভাবে রিজিওনাল অফিস নামে অভিহিত করা হয়। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ বিশেষ করে ব্রাঞ্চ, এরিয়া এবং জোনাল অফিস সদর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অবস্থায় কাজ করে। জোনাল অফিস মিনি হেড

www.bjilibrary.com

অফিস হিসেবে কাজ করে যেখানে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বড় রকমের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ছাড়া সকল প্রকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সদর কার্যালয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং বিদেশী উৎস থেকে ঋণ তহবিল ও অনুদান সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকে।

গ্রামীণ তৎপরতার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পেলেও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক চলে আসছে। ব্যাংকটির ক্ষুদ্র ঋণ মডেল, টার্গেট নির্বাচনের বাস্তবতা, সামাজিক উন্নয়নের ধারণা বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, ঋণ আদায়ের কঠোরতা প্রভৃতি সারা দেশে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। Traditional Banker-রা এর বিরোধিতা করেছেন। লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বিরাট অংশ ব্যাংকটির কার্যক্রমকে শোষণমূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাংকের তরফ থেকে এর সাধারণ ঋণের সুদের হার Declining Balance পদ্ধতিতে ২০% দাবী করা হলেও ঋণ ও অর্থ বিশেষজ্ঞরা এই হার ৩৯ শতাংশ থেকে ৮৭ শতাংশ বলে জানিয়েছেন। দরিদ্র মানুষদের সংগঠিত করে ঋণ দিয়ে তার কিস্তি আদায়ের জন্য তাদের বাড়ীঘর সহায় সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য করার ন্যায় হৃদয় বিদারক বহু ঘটনারও তারা উল্লেখ করেছেন। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে মান সম্মান রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়ার অসংখ্য ঘটনাও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলসহ প্রায় প্রত্যেকটি জিলায় আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত কৃষক শ্রমজীবী মানুষরা ব্যাংকটির বিরুদ্ধে বহু মিছিল ও শোভাযাত্রা বের করেছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প ও ঠাকুরগাঁও প্রকল্পের প্রায় তিন হাজার গভীর নলকূপ এক সময় এই ব্যাংকটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু কৃষকদের সঙ্গতির কথা বিবেচনা না করে বাণিজ্যিক হারে পানির মূল্য নির্ধারণ করায় অচিরেই উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং গভীর নলকূপ পিছু কম্যান্ড এরিয়া গড়ে ৬০ একর থেকে ৩৫ একরে নেমে আসে। শেষ পর্যন্ত সরকার ব্যাংকের সাথে চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয় এবং গ্রামীণ ব্যাংক গভীর নলকূপগুলো ফেরৎ দেয়। মহিলাদের ক্ষমতায়নের নামে একইভাবে এই ব্যাংকের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও দেশের পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। তারা স্বামীদের বিরুদ্ধে স্ত্রীদের লেলিয়ে দেয়া এবং বিভিন্ন স্থানে পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টির জন্য কাজে ব্যাপৃত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠে। আরো অভিযোগ উঠেছে যে গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের দরিদ্র মানুষদের মহাজনী শোষণ থেকে মুক্ত করার নামে দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ নতুন মহাজন সৃষ্টি করে শোষণ প্রক্রিয়াকে আরো সংহত করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক বরাবরই এই অভিযোগসমূহ অস্বীকার করেছে। তথাপিও এ অভিযোগসমূহের যথার্থতা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা জরুরী বলে মনে হয়।

www.bjilibrary.com

গ্রামীণ ব্যাংক স্বীকার করুক বা না করুক মহাজনী ব্যবসা যে বেড়েছে দেশী বিদেশী বহু সমীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে। সুইডিশ সিডা ১৯৯৮ সালে সম্পাদিত এক সমীক্ষায় দেখিয়েছে যে, গ্রামীণ ব্যাংকের শতকরা ৬০ ভাগ ঋণ গ্রহিতা ঋণ নিয়ে মহাজনী কাজে খাটায়। তারা দেশের সতেরটি জিলায় কেস স্টাডি করে দেখিয়েছে যে একজন মহিলা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৫ হাজার টাকাই গ্রামের অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে লগ্নি করে। এর বিনিময়ে তিনি সাত মাস পর ১০ মন ধান পান এবং নবম মাসে তাকে আসল ৫০০০/- টাকা ফেরৎ দেয়া হয়। স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসব মহিলা আংশিক কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। লগ্নির টাকা চূড়ান্ত ঋণ পরিশোধে তাদের সহায়তা করে। বলা বাহুল্য বাজার দর অনুযায়ী এই ধানের মূল্য ঐ সময় মন প্রতি ২০০ টাকা হারে ২০০০ টাকা ছিল, বর্তমানে অন্যূন ৪০০০ টাকা। অর্থাৎ এ টাকার সুদের হার দাঁড়ায় শতকরা বার্ষিক ৬৮ টাকা (১৯৯৮)। সিডা জরীপে গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্ত লগ্নির ৫টি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। রিপোর্টের ভাষায় পদ্ধতিগুলো হচ্ছে :

System 1 : The borrower meets all credit instalments with normal rate of interest and after repaying all of the instalments, the principal amount is refunded to the lender. For example if a member of a group takes a credit of Tk 5000/- and hand it over to a borrower, he or she will provide money to pay the instalments of the lender and after 11 months when all instalments with interest are repaid the Original Tk. 5000/- is to be refunded to the lender. If a borrower is unable to refund the money he or she will have to continue to pay instalments at the equivalent amount (Tk. 500 each month) until he refunds the principal amount. This is the most common and popular system followed in the village.

System 2 : Some women give their credit money to grocery shop owners on the condition that the owners will provide the instalments with interest and also a fixed amount of daily consumable goods like rice, pulses, oil etc. free of cost to the lender until all instalments are repaid.

System 3 : In some cases the group member lends the credit money on higher interest rate of upto 150 to 200 percent. This system is for shorter periods of time, between two and six months.

System 4 : Some influential people, i.e. members of the union council or local elite/leaders also use group members for borrowing money

www.bjilibrary.com

from Grameen Bank and NGOs. They obligate the members by providing money for meeting initial costs like an enrolment fee, savings etc. The members borrow money and hand over to them. The lender is provided with saree, lungi and other clothing, besides the repayment of the instalment.

System 5 : In an emergency, the borrower can get money from the lender on a daily interest basis. For example, for short term loans, the borrower has to pay Tk 10.00 per day for Tk 1000.00" (Ending Proverty? The Experience of NORDIC support to IRWP/RESP in Bangladesh, SIDA Final Report, 1998.)

লগ্নির এই ব্যবসাকে রিপোর্টে মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যেহেতু এই লেনদেনে সাক্ষী কিংবা লিখিত চুক্তি থাকে না সেহেতু অনেক সময় গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা প্রতারণার শিকার হন, এসব ক্ষেত্রে হতাশায় অনেকে আত্মহত্যাও করেন। গ্রামীণ ব্যাংক ও এনজিও ঋণের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ এভাবে লগ্নি ব্যবসায়ে খাটানো হয় বলে রিপোর্টে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১০২-১০৬)। ঋণের টাকা খাটিয়ে উপার্জন করার আগেই কিস্তি পরিশোধের বাধ্যবাধকতা ঋণ গ্রহিতাদের এই দুঃসহ জীবনের দিকে ঠেলে দেয় বলে জানা যায়।

টার্গেট বহির্ভূত পুরুষ ও মহিলাদের গ্রামীণ গ্রুপসমূহের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা থেকেও এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠে। সুবিধাবঞ্চিত দিন মজুরীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও দারিদ্র্য বিমোচন গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও কার্যতঃ দেখা গেছে যে আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারসমূহের একটা বিশাল অংশ গ্রামীণ ব্যাংকের ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার সদস্য হচ্ছেন।

ড. মনিরুল ইসলাম খান তাঁর Poverty Alleviation and the Hardcore poor in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা পত্রে এর একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর দেয়া তথ্যানুযায়ী ক্ষুদ্র ঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে টার্গেট বহির্ভূত ধনী লোকের সংখ্যা ব্র্যাকের বেলায় ৩৩%, বিআরডিবির ক্ষেত্রে ৩১% এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৬০% (পৃঃ ২০)। আসাদুজ্জামান ও মসলির Findings ও অনুরূপ (দেখুন Role of Micro-credit in poverty Alleviation, comparison of NGO and Government Efforts in poverty and Development : Bangladesh Context. BIDS. Dhaka) ইতোপূর্বে উল্লেখিত লগ্নি ব্যবসা এবং গ্রামীণ গ্রুপসমূহে টার্গেট বহির্ভূত পরিবারসমূহের আধিক্য দারিদ্র্য বিমোচনে এই ব্যাংক ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের ইতিবাচক ভূমিকাকে স্পষ্টতর করে তোলে না বরং Poverty Culture-কে আরো সংহত করে তোলে বলে মনে হয়। ঋণ তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি না দিয়ে আরো বেশী ঋণের জালে আবদ্ধ করে ফেলে। গ্রামীণ ব্যাংকসহ ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা সমূহের

www.bjilibrary.com

সামগ্রিক কর্মসূচীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো প্রকৃত পক্ষে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান Oriented না হয়ে Repayment Oriented হিসেবে গড়ে উঠেছে, সম্ভবত এদেশের ঋণ খাতের দীর্ঘ দিনের খেলাপী কালচারকে মুকাবিলা করার জন্য। কিন্তু কোনও অবস্থার মুকাবেলা করে ব্যবসা করা আর মানুষের কল্যাণ করা কি এক? এই ব্যবসার অনুশীলন করতে গিয়ে গ্রামীণ ব্যাংককে Repayment capacity দেখতে হয়েছে।

তার মাঠ কর্মীরা এরই ধারাবাহিকতায় টার্গেট গ্রুপকে বাদ দিয়ে অবস্থা সম্পন্নদের বেশী হারে অন্তর্ভুক্তির বিষয় চিন্তা করতে হয়েছে। ৪০ শতাংশ অধমর্নের পরিশোধ ভাবনা তাদেরকে লগ্নি ব্যবসার দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ঋণের বরাদ্দ ও অনুমোদিত অংক, বিভিন্ন তহবিলের নামে কর্তন ও নগদ প্রাপ্তির ব্যবধান সুদের হারকে বৃদ্ধি করে। অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. খলিকুজ্জামান তার এক সমীক্ষায় সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের সুদ ৪৩% বলে উল্লেখ করেছেন। তিনিও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের উল্লেখযোগ্য কোনও ভূমিকা খুজে পাননি। (দেখুন Socio-economic & indeletedness related impact of Micro credit in Bangladesh, UPL, Dhaka)

দু'জন বিদেশী গবেষকও একথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁদের ভাষায় ঃ

Though targeted the poor and landless, Micro Credit in Bangladesh is not reaching the poorest of the poor in Bangladesh, but tending to benefit the middle or Upper stratifications of the poor people. There are a number of reasons for this :

* The poorest are self excluding from the Micro Credit programmes due to problem in living upto the regular savings requirements in these schemes and also due to the needs for immediate paid work for survival.
* Groups exclude the poorest as bad risks in credits that depend on a group as security for the loans.
* The MCOs (Micro Credit Organizations) tend to forcus on the less poor amongst the poor to reduce risk of default and to meet disbursement target. According to some observers, the dominating MCOs such as BRAC and Grameen have moved away from poorest to the less poor under pressure to be self-sustaining."

(দেখুন Hulme D & Mosly. P. Financing of the Innovation Poverty and Vulnerability in Wood & Sharif).

www.bjilibrary.com

আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি বিচ্যুতি, দরিদ্রদের উপর ধনীদের প্রাধান্য দেয়া, মহাজনী প্রথার প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ এবং ঋণ বিতরণে উৎপাদন খাতের তুলনায় সার্ভিস ও ট্রেডিং খাতের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ সামষ্টিক অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলছে বলে অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে ঋণের আকারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তার অনুকূলে পর্যাপ্ত পণ্য উৎপাদিত না হওয়ায় মূল্য স্ফীতি পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে বলে অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন। এতে গ্রামীণ Borrower-দের Financial ও Economic উভয় viability নষ্ট হয়েছে যার জন্য দারিদ্র্যের সমুদ্রে নাক ভাসিয়ে রেখে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য তাদেরকে লগ্নি ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়তে হচ্ছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের দাবী অনুযায়ী গ্রুপ গঠনের পর থেকে কমপক্ষে ছয় বছরের মধ্যে ঋণসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে তাদের সদস্যরা দারিদ্র্য মুক্ত হতে সক্ষম হন। পর পর ছয়টি ঋণ নেয়ার পর তারা দারিদ্রসীমা অতিক্রম করতে পারেন। এদেরকে গ্র্যাজুয়েট সদস্য বলা হয় এবং তাদেরকে তাদের অবস্থা আরো ভাল করার জন্য ব্যাংকের তরফ থেকে Entrepreneurship ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। ভাগ্যের পরিহাস এই যে বাংলাদেশে এ ধরনের ভাগ্যবান সদস্য খুবই কম লক্ষ্য করা গেছে। ব্যাংক ঋণ শোধ এবং অভাবের তাড়নায় অধিকাংশ সদস্যকে ৪/৫ টি সংস্থা থেকে ঋণ নিতে যেমন দেখা যায়, তেমনি ঋণ দেয়া বন্ধ করে দিলে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটতেও দেখা যায়।

দৈনিক দিনকাল গত ২২শে ফ্রেব্রুয়ারী গ্রামীণ ব্যাংকের সূতিকাগার জোবরার একটা করুণ কাহিনী রিপোর্ট করেছে। চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী উপজেলার জোবরা গ্রামের যে ৪২ জন সদস্যকে নিয়ে একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক যাত্রা শুরু করেছিল তাদের বর্তমান অবস্থা দেখে বুঝা যায় না যে বিশ্বজয়ী গ্রামীণ ব্যাংক তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন করতে পেরেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী এই সদস্যদের মধ্যে প্রথম সদস্য সুফিয়া খাতুন মারা গেলেও অন্যরা জীবিত আছেন। তাঁরা এখনো ভাঙ্গা ঘরে থাকে। রোগশোকে চিকিৎসা পান না। মনজুরা, জাহানারা, নূরপাখী, মঞ্জুয়া, নাজনীন, আনজুমান মরিয়ম এখন ভিক্ষা করেন। ফুটো চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি তাদের ঘরের মধ্যে পড়ে। কেউ কেউ এখনো গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ পান। সপ্তাহ যেতে না যেতে কিস্তির টাকা দিতে তাদের ঘাম ঝরে যায়। কারুর কারুর মতে কিস্তির টাকা কিভাবে দেব তা ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যেতে হয়। ৩১ বছর ধরে যে গ্রামের 'সেবা' করে যে গ্রামীণ ব্যাংক তার সদস্যদের দারিদ্র্য দূর করতে পারেনি সে ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা যখন দারিদ্র্যকে যাদুঘরে পাঠাবার ঘোষণা দেন তখন দরিদ্র মানুষরা একে তাদের ভাগ্যের সাথে রসিকতা বলেই মনে করেন। শুধু জোবরা নয়, যশোর থেকে ১৬

www.bjilibrary.com

কিঃ মিঃ উত্তর পশ্চিমে ঝিনাইদহ সড়কে মশিয়াটি ঋষি পাড়ার অবস্থাও একই রকম। ১৯৯৫ সালের ৩রা এপ্রিল তৎকালীন মার্কিন ফার্স্ট লেডি হিলারী ক্লিনটনকে গ্রামীণ ব্যাংক কালিগঞ্জ উপজিলার এই গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে এই গ্রামের নাম রাখা হয় হিলারী পল্লী। তাঁর সফর উপলক্ষে এই গ্রামের ৮০টি পরিবারের চেহারা পাল্টে গিয়েছিল। গ্রামীণ ব্যাংকের তরফ থেকে ৮০টি পরিবারকেই ঢালাওভাবে ঋণ দেয়া হয়। তারা বেশ কিছু পাকা বাড়ী তৈরি করেন। ঘরে ঘরে পাকা ল্যাট্রিন বসানো হয়। পুঁজি সংকটে বিপর্যস্ত গ্রামের কারিগরদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। ফলে গ্রামের চেহারাই পাল্টে যায়। মার্কিন ফার্স্ট লেডি হিলারী ক্লিনটন গ্রামীণ ব্যাংকের কাজে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর এই সন্তুষ্টি পরবর্তীকালে ড. ইউনুছের নোবেল প্রাপ্তিকে সহজতর করেছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক আসলে কি তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পেরেছে? দৈনিক সমকাল তাদের অবস্থা বর্ণনা করে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী একটি সরেজমিন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী হিলারী পল্লী ঋষি পাড়ায় এখন সমৃদ্ধি নেই, হাহাকার বিরাজ করছে। এই গ্রামের গোপাল ঋষীর স্ত্রী মমতাজ গ্রামীণ ব্যাংক থেকে দুই হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন, কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় তার ঋণের বোঝা বাড়ছিল, পরে তিনি আরো ঋণ নেন। এর কিস্তির টাকা যোগাড় করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তাঁকে দাদন নিতে হয় পাশের ফুলবাড়িয়া গ্রাম থেকে। গোপাল ঋষী জানান দু'দিকের কিস্তি শোধ করতে গিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র সম্বল জমিটুকুও বিক্রি করে দিতে হয়েছে। ঐ গ্রামের ভক্তের আক্ষেপ অনুযায়ী হিলারীর আগমনের সময় তাঁকে স্ত্রী পার্বতীর নামে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়েছিল। পরে জুতা তৈরির ফর্মা, ছাগল, গরু প্রভৃতি বিক্রি করে তিনি ঋণের কিস্তি শোধ করেছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণে তৈরি ঘরটিও ভেঙ্গে গেছে। এখন তিনি পরের বাড়ীতে থাকেন। বাঁশ বেতের কারিগর কেতু রাম তার স্ত্রীর নামে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা শোধ করার জন্য প্রথমে মহাজনী দাদন ও পরে সেটা শোধ করার জন্য একমাত্র সম্বল চার শতাংশ জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গ্রামের অপেক্ষাকৃত অবস্থাসম্পন্ন হাতে গোণা কয়েকটি পরিবার ছাড়া প্রায় সবাই ঋণী। গ্রামীণ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এখন তারা অর্থ লগ্নিকারী প্রায় সকল এনজিওর কাছে দায়গ্রস্ত।

শুধু অর্থনৈতিক চিত্র নয়, বহুল আলোচিত এই গ্রামটিতে সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখনো সেখানে অশিক্ষা, যৌতুক প্রথা ও বাল্যবিবাহ অব্যাহত রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক তার শপথ ও অঙ্গীকার অনুযায়ী এর কোনটাই উচ্ছেদ করতে পারেনি। তার সবচেয়ে চমকে যাবার মতো ঘটনা হলো, ১৯৯৫ সালে হিলারী ক্লিনটন এই গ্রামে পা রাখতেই যে দু'টি মেয়ে তাঁর গলায় মালা পরিয়েছিল, সিরাম ঋষীর মেয়ে

www.bjilibrary.com

সাথী ও মুকুন্দ ঋষীর মেয়ে মুক্তি, তারাও বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে এবং গ্রামীণ ব্যাংকের টাকায়ই তাদের যৌতুক দেয়া হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের শেখানো বুলির শপথ মাঠে মারা গেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের উন্নয়ন তৎপরতা শুরু থেকেই যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে দুনিয়ার ইতিহাসে তা বিরল। এই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কিস্তি শোধ করতে না পেরে এ যাবত সারা দেশে ১২৩৭ জন লোক আত্মহত্যা করেছেন। গ্রামীণ কর্মীরা কর্জ খেলাপের অভিযোগে গাছের সাথে বেঁধে রেখে অপমান করেছে শিক্ষকসহ অসংখ্য মানুষকে।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এক গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য দূরীকরণের চেয়ে ঋণ বিতরণ ও আদায়েই বেশী সফল। ঋণ গ্রুপ সদস্যদের মূলধনের কিছুটা সুযোগ করে দিলেও তাদের যে অতিরিক্ত আয় হয় তা থেকে সুদাসলে কিস্তি পরিশোধ করার জন্য তা যথেষ্ট নয়, ভোগ কাঠামোর পরিবর্তন তো দূরের কথা। রিপোর্ট অনুযায়ী ঋণ গ্রহিতারা বেশীর ভাগ টাকা নেন ব্যবসার জন্য। কিন্তু ব্যবসাতে কোনো নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয় না। হাত বদল হয় মাত্র। এতে বলা হয় গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দানের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাদের আরো অধিক ঋণে জড়িয়ে ফেলছে। দেখা গেছে যে আগে অনেকে একটি ঋণ নিত, কিন্তু বর্তমানে আরো বেশী করে ঋণ নিচ্ছে। ওই টাকা দিয়ে আগের ঋণ শোধ করছে। স্বচ্ছল ঋণ গ্রহিতারা টাকা নিয়ে আরো অধিক সুদে অপরকে ঋণ দিচ্ছে। ঋণের টাকা কাগজ পত্রে যেভাবে দেখানো হয় বাস্তবে সেভাবে ব্যবহার হয় না। ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলে পাশ বই ফেরৎ নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। নিকটাত্মীয়দের নিয়ে গ্রুপ গঠন নিষিদ্ধ হলেও গ্রামীণ ব্যাংকে তা হচ্ছে। ফলে অধিকাংশ ব্রাঞ্চ ও কেন্দ্র দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক জনাব আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে গ্রামীণ ব্যাংক তাদের সুদের হার ২০% দাবী করলেও প্রকৃত পক্ষে তা ৩৩.৮৭% থেকে ৪৪% পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রিপোর্টের আরেকটি তথ্য হচ্ছে, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে যারা ঋণ নিয়েছেন এবং যারা ঋণ নেননি তাদের উভয়ের আয়ের অবস্থা প্রায় একই রকম। ঋণ নিয়ে কর্মসংস্থান করে পারিবারিক অবস্থা উন্নত করার স্বপ্ন এখানে বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্য গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ বিতরণ করতে গিয়ে গ্রামের অনেক নিরক্ষর মহিলাকে নাম দস্তখত করতে শিখিয়েছেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা তাদের কৃতিত্ব।

সুদ নির্ণয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের শুভংকরের ফাঁক বাংলাদেশ ব্যাংকও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি পরিদর্শন টীম তদন্ত শেষে গ্রামীণ ব্যাংকের আদায়কৃত সুদের হার ধার্যকৃত সুদের চেয়ে অনেক বেশী বলে মন্তব্য করেছে এবং তাদের সুদের হার কমানোর পরামর্শ দিয়েছে। একই ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের

www.bjilibrary.com

পরিদর্শন টীম বলেছে যে গ্রামীণ ব্যাংকের মূলধনের সিংহভাগ এসেছে ভূমিহীনদের কষ্টার্জিত অর্থ থেকে, অথচ জন্মলগ্ন থেকে ব্যাংকটির তরফ থেকে মূলধন সরবরাহকারীদের কোনো লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি। টীম একে অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করেছে।

ভিক্ষাবৃত্তি রোধে গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগ অবশ্য কিছুটা প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাদের কাছ থেকে সুদবিহীন ঋণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিক্ষুকদের কেউ কেউ পুনর্বাসিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এটা তাদের অনন্য কৃতিত্ব বলা যাবে না। কেননা তৎকালীন আইআরডিপি'র অধীনে পরিচালিত মহিলা কর্মসূচীর পক্ষ থেকে ১৯৭৮ সালেই ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। সমাজ সেবা অধিদপ্তরেরও অনুরূপ প্রকল্প রয়েছে এবং মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

বিনিয়োগকৃত ঋণের ৯৮ শতাংশ আদায়কে (যদিও এ ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে) গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যতম সাফল্য বলে দাবী করা হয়। বিআরডিবি মহিলা অধিদপ্তর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের তরফ থেকে পরিচালিত অধিকাংশ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর ঋণ আদায়ের সাফল্যও ৯৫ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ। তাদের ঋণ আদায়ে কর্জ গ্রহীতাদের উপর নির্যাতন কিংবা তাদের আত্মহত্যার কোনও খবর শোনা যায় না, যেমন শোনা যায় গ্রামীণ ব্যাংকের বেলায়। তবে গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ অর্থ বাজারে যে একটা ঢেউ তুলতে সক্ষম হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহিতারা viable হতে পারেনি এবং তাদের অধিকাংশই যে এখনো পর্যন্ত পর নির্ভরশীল এটা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জোবরা ও হিলারী পল্লীর অবস্থা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের দান অনুদান ও ভর্তুকী মুক্ত হয়ে নিজের পায়ে চলার ক্ষমতা বিগত আড়াই দশকেও অর্জিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাংকসহ একটি এনজিও প্রতিনিধিদল কর্তৃক সরকারের নিকট তহবিল প্রার্থনা এর অন্যতম প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত তার শেয়ারহোল্ডারদের কখনো লভ্যাংশ দিতে পারেনি। এর অর্থ হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক Economic viability ও Financial viability কোনটাই এখনো পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন থেকেই একক নেতৃত্বে চলছে। ড. ইউনুছের অবর্তমানে তার institutional viability কতটুকু থাকে সেটাও প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে দেশের কথা; কম বেশী করুণ উপাখ্যান। বলা হচ্ছে যে বিদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য অসাধারণ। আমাদের কোনো রফতানী পণ্য যদি বিদেশে প্রশংসা কুড়ায় তা হলে গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠা স্বাভাবিক। বাইরে এটা কিভাবে চলছে সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ কোন মূল্যায়ন আমার নজরে পড়েনি, যা বলা হচ্ছে তার কতটুকু

www.bjilibrary.com

সত্য, কতটুকু প্রচারণা বলা মুশকিল। তবে আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ আলোকিত পরিস্থিতির ইঙ্গিতবহ নয়। বলা হয় যে ফিলিপাইনে গ্রামীণ ব্যাংক সফলভাবে তার মডেল বাস্তবায়ন করছে এবং ২৬/২৭ লক্ষ লোক এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে উপকৃত হচ্ছে। ম্যানিলার অদূরে এপিটিং, লসবেনসের ক্রসিং এবং কালাম্বার তিনটি গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকের কথিত কর্মসূচী দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। তিনটি গ্রামের অবস্থাই হতাশাব্যঞ্জক। এপিটিং-এ ৮৭ জন দিয়ে তারা কাজ শুরু করেছিল কিন্তু তাদের সুদের হার, বিতরণ কালীন কর্তন, উপার্জনের আগে কিস্তি পরিশোধের তাড়া প্রভৃতি দেখে সদস্যদের মোহভঙ্গ ঘটেছে। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে তারা মহাজনদের বেশী পছন্দ করে। অন্য দু'টি গ্রামে এখন কর্মসূচীই নেই। ইংল্যান্ডের এনফিল্ডের অবস্থাও একই রকম।

আমার মনে হয় যে কোন কর্মসূচীর Replicability'র জন্য কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে :

ক) পরিবর্তিত ও প্রস্তাবিত ব্যাংকিং পদ্ধতি কেন প্রয়োজন।

খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঋণ চাহিদা কি এবং তাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য করণীয় কি।

গ) অভীষ্ট দল বা গোষ্ঠীকে ঋণ সরবরাহের জন্য সামাজিক মেকানিজম বাহন হিসেবে কাজ করবে কি না।

ঘ) দলভুক্ত ব্যক্তিদের সামাজিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধতা আছে কি না।

ঙ) গ্রুপ বা ব্যক্তিভিত্তিক ঋণ দাদনের সম্ভাব্যতা এবং ব্যয় সাশ্রয়তা।

চ) ঋণের উপর সুদ আরোপের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যয়ের আদায় যোগ্যতা।

ছ) আর্থিক ও সামাজিক ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ দরিদ্র ব্যক্তিরা বহন করতে পারবেন কি না এবং

জ) স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

গ্রামীণ মডেলের ভাষায় চমক আছে, বিদেশীদের আকৃষ্ট করার জন্য ক্যারিসমা আছে। কিন্তু মানুষের অবস্থার বাস্তবতা এবং রক্ত মাংসের ঐতিহ্যের সাথে মিল নেই। সম্ভবত এ কারণেই দেশ বিদেশে তৃণমূল পর্যায়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা এখনো সন্তোষজনক নয়।

উপরে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ব্যাংকটি তার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে ব্যাংকটি যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা বলাও ঠিক হবে বলে আমার মনে হয় না। গ্রামীণ ব্যাংক নিছক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি আর্থসামাজিক আন্দোলন ও একটি জীবন দর্শন যা নারীকেন্দ্রিক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য নগণ্য হলেও গ্রামের লজ্জাবতী নারীদের বের করে আনা এবং পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা সম্ভবত

www.bjilibrary.com

ব্যাংকটির সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই সাফল্য আমাদের আবহমানকালের মূল্যবোধকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং তার পরিণতি কি হবে তা এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক আচারের কারণে সুদের প্রতি এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক একটা ঘৃণাবোধ ছিল। সুদখোরদের সাথে অনেকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়তে অপছন্দ করতেন। গ্রামীণ ব্যাংক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনানুষ্ঠানিক মহাজনী প্রথা ছড়িয়ে দিয়ে এই মূল্যবোধকে পরিবর্তন করতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়। নারী স্বাধীনতার পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা প্রচলনের লক্ষ্যে এ অবস্থাকে অনেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুতের পর্যায় বলে মনে করেন। তবে যেভাবে দেশব্যাপী এই ব্যাংকটির মুখোশ খসে পড়তে শুরু করেছে তাতে দর্শন ও কৌশল পরিবর্তন না করলে এই প্রতিষ্ঠানটি তার গ্রহণযোগ্যতা আরো হারাবে বলে মনে হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে ড. ইউনুছের আবির্ভাব এই প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারে।■

লেখক-পরিচিতি : মুহাম্মদ নূরুল আমিন– সাংবাদিক, কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক এবং সহকারী সম্পাদক– দৈনিক সংগ্রাম।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২১শে এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.bjilibrary.com

পশ্চিমা জগতের ইসলামফোবিয়া

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী

■

ভূমিকা

দিকের মানদণ্ডে পশ্চিমা একটি আপেক্ষিক শব্দ। জাপানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান পশ্চিমে হলেও পাক ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলকে পশ্চিমা জগত বলা হয়না। ইরাক, ইরান কিংবা আরব জাহানও পশ্চিমা জগত হিসেবে পরিচিত নয়। বরং পশ্চিমা সভ্যতার ধারক বাহকদের নিয়ে মূলতঃ ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রভাবিত দেশসমূহকে পশ্চিমা জগত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সোভিয়েত বলয়ের বিশ্বনেতৃত্ব থেকে অপসারণের পর দুনিয়ার মোড়লীপনা একই মেরুতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। পশ্চিমারা এর ফলশ্রুতিতে নিজেদের দাবীকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও সভ্যতার প্রভাব বিশ্বায়নের নামে ইলেক্ট্রনিক সুপার হাইওয়ের মাধ্যমে অন্যান্য জাতির উপর আরোপ করার একতরফা সুযোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তারা পথের বাধা হিসেবে একমাত্র ইসলামী সভ্যতাকে সামনের পথ আগলে থাকতে দেখে। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সভ্যতার সংঘাতের নামে বহু কাল্পনিক চিত্র তারা অংকন করে–যেমন বাঘ মেষ শাবকের উপর চড়াও হতে করেছিল। পশ্চিমা সভ্যতার একমাত্র প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা ইসলামী সভ্যতাকে শক্ত প্রোথিত ভিত্তির উপর দ ায়মান থাকতে দেখে। বহু ঘাত প্রতিঘাত মুকাবিলা করেও এই বুনিয়াদী সভ্যতা এখনও টিকে আছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এ সভ্যতা ধ্বংস করতে না পেরে তারা এর উপর নানারূপ কালিমা লেপনে আদা জল খেয়ে নেমে পড়ে।

www.bjilibrary.com

ইসলামের পরে অধিযোজিত ফোবিয়া একটি গ্রীক শব্দাংশ যা ভীতি আতংক, ঘৃণা ও নিন্দা মিশ্রিত এক ভয়াবহ অবস্থার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শব্দগত অর্থ করলে ইসলাম ফোবিয়ার অর্থ বুঝায় ইসলাম সম্পর্কে অসঙ্গত ভীতি। 'কালচারাল প্লুরালিজম' এবং গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে পশ্চিমারা নিজেদের যতই টলার‍্যান্ট হিসেবে দাবী করুক না কেন তারা ইসলামকে আদৌ বরদাশত করতে পারে না। ইসলামের বিধি-বিধান ও সামাজিক দর্শনের প্রতি খোলা ও মুক্ত মনের দৃষ্টি না দিয়ে তারা নিজেদের পোষণ করা বদ্ধমূল বিকৃত ধারণা দিয়ে তা এক ফোবিয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে। এই ভ্রান্ত উপলব্ধির বিশ্লায়নের লক্ষ্যে যা কিছু করণীয় তা কার্যকর করার জন্য তারা আধুনিক যাবতীয় টেকনোলজী ও উপকরণ, শক্তিশালী মিডিয়া, উপনিবেশবাদী চক্রান্ত মুসলিম বিশ্বের উপর একযোগে প্রয়োগ করে। 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি প্রয়োগ করে উম্মাহর উপর তারা পশ্চিমা সিভিলাইজেশনের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তাদের মূল টার্গেট ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার সমূলে বিনাশ সাধন করার যাবতীয় মেকানিজম কার্যকর করে। এই প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে পশ্চিমা জগতের ইসলাম ফোবিয়া।

পশ্চিমাদের ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে বিকৃত বদ্ধমূল ধারণার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লন্ডনভিত্তিক The Runnemede Trust এর এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। ইউরোপিয়ান মনিটরিং সেন্টার অন রেসিজম এন্ড জেনোফোবিয়া ইসলাম ফোবিয়ার মাঝে নিম্নোক্ত আটটি বিকৃত ধারণা ও তৎপরতা তুলে ধরে।

Islam is seen as a monolithic bloc, static and unresponsive to change.

Islam is seen as separate and 'other'. It does not have values in common with other cultures, is not affected by them and does not influence them.

Islam is seen as inferior to the West. It is seen as barbaric, irrational, primitive and sexist.

Islam is seen as violent, aggressive, threatening, supportive of terrorism and engaged in 'clash of civilisations'.

Islam is seen as a political ideology and is used for political or military advantage.

Criticisms made of the West by Islam are rejected out of hand.

Hostility towards Islam is used to justify discriminatory practices towards Muslims and exclusion of Muslims from mainstream society.

Anti-Muslim hostility is seen as natural or normal.

'Islam phobia and its consequences on young people' এ দেয়া সংজ্ঞানুসারে 'Islam phobia is a prejudiced view point toward Islam, Muslim and matters pertaining to them'.

www.bjilibrary.com

গোড়ার দিকে ইসলামফোবিয়া ছিল কতকটা বর্ণবাদ ও আঞ্চলিকতা কেন্দ্রিক। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বেশ কিছু সমাজ বিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের পর্যবেক্ষনে এই ফোবিয়া কেন্দ্রের বেশকিছু সরণ ও নড়-চড় অবস্থা ধরা পড়ে। তখন ইসলাম ফোবিয়া বর্ণকেন্দ্রিকতা ছাড়িয়ে পশ্চিমাদের আত্মাভিমানী শ্রেষ্ঠত্ব, তাদের সুস্পষ্ট ভিন্নতা এবং ইসলাম সম্পর্কে পোষণ করা তাদের বিকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট অভিমতের ভিত্তিতে প্রচারিত ও সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। উইকেপেডিয়ার বর্ণনা অনুযায়ী ঃ

Islamophobia is the fear and/or hatred of Islam, Muslims or Islamic culture. Islamophobia can be characterised by the belief that all or most Muslims are religious fanatics, have violent tendencies towards non-Muslims, and reject as directly opposed to Islam such concepts as equality, tolerance, and democracy. It is viewed as a new form of racism whereby Muslims are treated as an ethno-religious group.

Islamophobia is a neologism with no agreed definition. For example, the 2003 edition of the New Oxford Dictionary of English refers to Islamophobia as "hatred or fear of Islam or Muslims, especially as a political force" while Princeton University's "Word Net" defines Islamophobia as "prejudice against Muslims". The term, which is known to date back to 1991, became prominent in the wake of the September 11, 2001 attacks.

The concept of Islamophobia has attracted some controversy, and a number of writers, journalists, and intellectuals including Salman Rushdie, author of *The Satanic Verses*, have criticized it for allegedly confusing the criticism of Islam as a religion with stigmatisation of its believers.

আল মাকতাবীর বর্ণনা অনুসারে বর্তমানে পশ্চিমাদের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষ এবং হিংস্রতার মাত্রা, ব্যাপ্তি ও গভীরতা প্রকাশের ও বুঝানোর জন্য ইসলাম ফোবিয়া শব্দ যথার্থ কিংবা যথেষ্ট হয়না। এর চেয়ে বরং 'ইসলামবিরোধী সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি' দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করে বুঝানো যায়।

The term 'Islamophobia' does not adequately express the full range and depth of antipathy towards Islam and Muslims in the West today.

ইসলামফোবিয়া ওয়াচ ওয়েবসাইটে ইউরোপিয়ান সোসাইটির অষ্টম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি সহিংসতা ও দমন নীতির বিভিন্ন সময়ের ধরণ ও প্রকৃতি বদলের তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন ঘটনা পরিবেশিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

Hostility towards Islam and Muslims has been a feature of European societies since the eighth century of the Common Era. It has taken different forms, however, at different times and has fulfilled a variety of functions. For example, the hostility in Spain in the fifteenth century was not the same as the hostility that had been expressed and mobilised in the Crusades. Nor was the hostility during the time of the Ottoman Empire or that which was prevalent throughout the age of empires and colonialism. It may be more apt to speak of 'Islamophobias' rather than of a single phenomenon. Each version of Islamophobia has its own features as well as similarities with, and borrowings from, other versions.

ইসলামফোবিয়ার বিভিন্ন রূপ

আমেরিকান জার্নালিস্ট স্টিফেন সোয়ার্জ (Stephen Schwartz) পশ্চিমাদের ইসলাম ফোবিয়া ও তার প্রচারণার ধারা তুলে ধরেছেন। পশ্চিমারা ইসলামের ইতিহাস এবং এর সামগ্রিক জীবন বিধানকে 'চরমপন্থী'দের অপরাধের কা কারখানা হিসেবে দোষারোপ ও কালিমালেপন করে থাকে। তারা মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় কোন্দল, সংঘর্ষ ও বিরোধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুসলিম পক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত করে। তারা সুযোগ পেলেই ইসলামের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে বিরুদ্ধবাদীদের যুদ্ধে প্ররোচিত করে, উস্কানিমূলক আচরণ করে। কৌশলে মুসলিম উম্মাহর মাঝে কলহের বীজ ঢুকিয়ে দেয় এবং তা জিইয়ে রাখে। অমুসলিমদের নির্দেশনা মুতাবিক মুসলিমদের ধর্মীয় বিষয়ে পরিবর্তন আনতে সম্মত করার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে। সমসাময়িক বিশ্বে মুসলমানদের নিজস্ব কায়দায় পরিকল্পনা মাফিক তাদের অগ্রগামী হবার সক্রিয় ভূমিকা পালনের অধিকারকে অস্বীকার করে।

Forum Against Islam Phobia and Racism (FAIR) এর ওয়েবসাইটে ইসলাম, মুসলিম, মসজিদ, মুসলিমদের প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিমা জগতের ইসলাম ফোবিয়ার মারাত্মক প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে।

Islamophobia is the fear, hatred or hostility directed towards Islam and Muslims. Islamophobia affects all aspects of Muslim life and can be expressed in several ways, including:

attacks, abuse and violence against Muslims

attacks on mosques, Islamic centres and Muslim cemeteries

discrimination in education, employment, housing, and delivery of

www.bjilibrary.com

goods and services, lack of provisions and respect for Muslims in public institutions.

বিবিসির ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষক Roger Hardy ইসলাম ফোবিয়ার সামাজিক প্রভাব "Healing the Cartoon row wounds" শীর্ষক এক প্রকাশনার মাধ্যমে অনুরূপভাবে চিত্রিত করেছেন। তার সংজ্ঞানুযায়ী Islamophobia is fear and hatred of Islam and Muslims.

যুক্তরাজ্যের মুসলিম কাউন্সিল ফর রিলিজিয়াস এন্ড রেসিয়াল হারমোনি সংগঠনের সভাপতি ড. আবদুল জলিল সাজিদ "Anti-Semitism and Islam phobia : Two sides of the same Coin" শীর্ষক আলোচনায় ইসলামের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছড়ানো এবং এরই ফলশ্রুতিতে পুরো মুসলিম উম্মাহ কিংবা অধিকাংশ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা ও ভীতি ছড়ানোর কর্মকা ও ষড়যন্ত্রমূলক যাবতীয় তৎপরতা চালানো ইসলাম ফোবিয়ার সৃষ্ট পরিণতি হিসেবে তুলে ধরেছেন।

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের Chriss Allen এবং Jorgen S. Neilsen কর্তৃক প্রণীত ১১ সেপ্টম্বর, ২০০১ পরবর্তী ইসলাম ফোবিয়া বিষয়ক এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ইউরোপিয়ান মনিটরিং সেন্টার অন রেসিজম এন্ড জেনোফোবিয়া (EUMC) ৯/১১ ঘটনার পর ইসলাম ফোবিয়া পর্যবেক্ষণে সর্ববৃহৎ একটি যাচাই প্রকল্প গঠন করে। এই পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদনের মাঝে ইসলাম ফোবিয়ার কারণে মুসলিমদের উপর বাছ-বিচারবিহীনভাবে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সবার প্রতি যেভাবে কালিমা লেপন করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক মহল থেকে মুসলিম জনপদের উপর সন্ত্রাস চাপানো হয়েছে এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের যেভাবে নাজেহাল করা হয়েছে তার বহু করুণ ও প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

According to the report, despite localised differences within each member nation, the recurrence of attacks at street level upon recognisable and visible traits of Islam and Muslims was the report's most significant finding. These attacks took such form as the following: verbal abuse indiscriminately blaming all Muslims for terrorist attacks; women having their hijab torn from their heads; male and female Muslims being spat at; children being called 'Usama' as a term of insult and derision; and random assaults, which on one occasion, left a victim paralysed and others hospitalised.

The representation of Muslims in the media was also noted. Whilst some media initially attempted to differentiate Muslims, this was not always the norm. Inherent negativity, stereotypical images, fantastical

www.bjilibrary.com

representations and grossly exaggerated caricatures were all readily identifiable, drawing upon pre-9/11.

তারিক রামাদান এর 'ইসলাম এন্ড মুসলিমস ইন ইউরোপ' নামক প্রকাশনায় যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ভারতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত সন্ত্রাস ও অবিচারমূলক আচরণের বহু বর্বরোচিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

The term most often appears in discourse on the condition of immigrant Muslims living as minorities in the United States, Europe, and Australia, although it has also been used in recent years in countries such as India, and occasionally in connection with non-immigrant Muslim communities or individuals. In the most prominent cases, however, experiences of immigrant communities of unemployment, rejection, alienation, and violence have allegedly combined with Islamophobia to make integration difficult. Maleiha Malik has argued that this has led, in the United Kingdom, to Muslim communities suffering higher levels of unemployment, poor housing, poor health, and higher levels of racially motivated violence than other communities.

নিউ স্টেটসম্যান (New Statesman) এর মাঝে ইসলাম ফোবিয়ার এক ভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। আরব বিরোধী বর্ণবাদী জাত্যাভিমান এবং কর্তৃত্বশীল, উন্নত ও উৎকৃষ্ট জাতি হিসেবে উদ্ভূত ভাবানুভূতির ভিত্তিতে সৃষ্ট ইসলাম ফোবিয়া ক্রমশঃ ভিন্ন মাত্রা ও ডাইমেনশনে তার আগ্রাসন বাড়াতে থাকে। যার ফলে দেখা যায় জার্মানীতে ইসলাম ফোবিয়ার শিকার যারা হয় তাদের অধিকাংশই ছিল অনারব, টার্কিস। অথচ তুরস্কই সম্ভবত ধর্মনিরপেক্ষতার দিক থেকে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী মুসলিম জনবসতির দেশ।

মুসলিম বিদ্বেষী পক্ষপাতদুষ্ট এই প্রচারণার শিকার হিসেবে কোন কোন ক্ষেত্রে শিখ জনগণও আক্রান্ত হতে বাদ পড়েনি। তাদের বিশেষ চেহারা ও পাগড়ি ব্যবহারের কারণে মুসলিম হিসেবে চেহারার ভুলে তারাও ইসলাম ফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়।

The Guardian পত্রিকার রিপোর্টে ভারতের ইসলাম ফোবিয়া প্রভাবিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর জঘন্য কালিমা লেপন এবং অতীতের ক্রুসেডের ঘটনার অনুরূপ মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিভিন্ন জঘন্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৯৬ সালে মিশরে অনুষ্ঠিত "লোহিত সাগর শীর্ষ সম্মেলনে" ইসলাম ফোবিয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, রুশ প্রেসিডেন্টসহ ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রধানগণ যোগ দেন। তখন এই ফোবিয়ার মূল ছিল নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন ও রক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে

www.bjilibrary.com

অবস্থিত পাগলপারা কিছু মুসলিমের জীবন-মরণের সমস্যা কেন্দ্রিক। ১৯৪৮-৪৯ সনে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মিরের মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারণের লক্ষ্যে সেখানে গণভোট অনুষ্ঠানের ফায়সালা হয়। ইসলাম ফোবিয়ার কারণেই আজ পর্যন্ত এর ইতিবাচক ফল আসেনি। ভারতকে এ বিষয়ে কোন চাপ না দেয়া হলেও জাতিসংঘের চাপে ইন্দোনেশিয়ার খৃস্টান প্রধান পূর্ব তিমুরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এটাও ভারতের ইসলাম ফোবিয়া প্রভাবিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এছাড়া পুনা, আহমেদাবাদ, গুজরাট ও এহেন বহুক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া রক্তক্ষয়ী দাংগা, জনবসতি পুড়িয়ে দেয়া, মানবাধিকারের চরম লংঘন এবং নির্যাতনের বর্বর চিত্র প্রায়শঃই চোখে পড়ে।

ইউনিপোলার বিশ্বে পশ্চিমা আধিপত্য বিস্তার ও একচ্ছত্র করণের স্বার্থে ইসলামের গায়ে যেকোন ছুতোয় দোষ চাপিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসবাদের বিশ্বায়নের ক্রু হচ্ছে ইসলাম ফোবিয়া। আমেরিকার এই চালের শিকার হয়ে আজ ক্ষত-বিক্ষত ও ধ্বংস হচ্ছে বিশ্বমানচিত্র এবং মানবতাবাদ। নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরাইল ফিলিস্তিনে, ভারত কাশ্মীরে, রাশিয়া চেচনিয়ায় এবং মায়ানমার আরাকানে। আফগানিস্তান, ইরাক ও বর্তমানে ইরানকে নিয়েও পশ্চিমারা একই ইসলাম ফোবিক ধ্বংসযজ্ঞের তৎপরতা চালাচ্ছে। ইসলাম ফোবিয়া মূলতঃ এভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একটি ছুতা-অস্ত্র হিসেবেই স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের ইসলামী টেরোরিস্ট বা মিলিট্যান্ট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ, মার্কিনীদের CIA এবং ভারতের RAW একযোগে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তথ্য সন্ত্রাসের জাল বহুকাল ধরেই পেতে রেখেছে। ১৯৮৭ সালে ৩০টি ইহুদী সংগঠনের বাছাইকৃত সেরা ক্রুকেড বুদ্ধিজীবীরা, দার্শনিক হার্টজালের নেতৃত্বে সুইজারল্যান্ডে এক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। মুসলমানদের কাবু করে সারাবিশ্বের মোড়লীপনা হাতে নেয়ার আকাঙ্ক্ষায় সেই সম্মেলনে ১৯টি প্রটোকল গ্রহণ করা হয়। এর দ্বাদশতম প্রটোকল অনুযায়ী তারা তাদের ইচ্ছামত বিশ্বের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন খুশী তেমন সাজে, যেকোন ইস্যু সাজিয়ে সাদাকে কালো কিংবা কালোকে ঝলমলে লাল হিসেবে তখন থেকে তারা পৃথিবীকে দেখিয়ে আসছে।

এসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস, এএফপিসহ বৃটেন ও মার্কিন মুল্লুকের হাজারো দৈনিক পত্রিকা প্রায় সবই এখন ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে। যুক্তরাষ্ট্র টেলিভিশনের ব্রডকাস্টিং কোম্পানীসমূহের যেমন ABC, CNN, NBC, CBC, PBC এসবসহ অনেকগুলোই এখন ইহুদীদের কর্তৃত্বে। এসব মিডিয়ার সাঁড়াশী আক্রমণে মুসলমানরা প্রায়শঃই কাবু হয়ে পড়ছে। Islamophobia এখন Paranoia-তে পরিণত হয়েছে।

Florida-য় এক রেডিও টকশোতে Shannon Burkey মুসলিমদের বিষয়ে নিম্নরূপ ইসলা ফোবিক মন্তব্য করে ঃ

www.bjilibrary.com

'Muslims are cruel and Islam hates education and democracy and any new invention is a threat to Allah'

Kim R. Holmes তার New World Disorder প্রবন্ধে বিশ্বে শান্তি এবং সম্প্রীতি রক্ষার জন্য New World Order দিয়ে পুরাতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন অপরিহার্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তথাপিও হানটিংটনের Clash of Civilization বিশ্বের মোড়ল শক্তিকে ভীতিহীন করে ইসলামী সভ্যতার উপর ক্র্যাক ডাউন এনে New World Order তথা পশ্চিমা সভ্যতার সর্বগ্রাসী বিশ্বায়নে উৎসাহী করে। এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার পরিকল্পনায় মার্কিন-ইন্দো-ইসরাইল একযোগে তাদের পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা করবে এবং দুর্বল মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে। উদার গণতন্ত্র, বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, কালচারাল প্লুরালিজম, এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হবে পশ্চিমারা– ইত্যাকার আগ্রাসী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিবেককে বোকা ও নির্বাক করার দুরভিসন্ধির অপর নামই হচ্ছে ইসলাম ফোবিয়া।

ICT সুপার হাইওয়ের মাধ্যমে বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। সেই শক্তিশালী ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং ইয়েলো জার্নালিজমকে তথ্য সন্ত্রাসের কাজে চরম অপব্যবহার করছে ইসলামের বিরুদ্ধে আধুনিক পশ্চিমা জগত। এই শক্তিশালী মিডিয়ার একচ্ছত্র মালিক তাদের নীল নকশা অনুযায়ী আজকের বহুধাবিভক্ত উম্মাহকে টার্গেট করে বিচিত্র ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়ে এবং তাকে বিকৃত করে সংশ্লিষ্ট টার্গেটকে ধরাশায়ী করার জন্য বিশ্বময় হৈ চৈ শুরু করে নিজেদের আগ্রাসী লিপ্সা চরিতার্থ করে। এ ঘৃণ্য তৎপরতার বহিঃপ্রকাশ হল ইসলাম ফোবিয়া।

'Root out this sinister cultural flaw' শীর্ষক এক নিবন্ধে Karen Armstrong মুসলিমবিরোধী ইসলামফোবিক বিকৃত ধ্যান ধারণার কদর্য বিবরণ তুলে ধরেছেন।

২০০৪ সালের শেষ দিকে জাতিসংঘ আয়োজিত "World: UN Forum Explores Ways to Fight Islamophobia" শীর্ষক এক সম্মেলনে কফি আনান ধর্মান্ধতার আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ঃ

The world is compelled to coin a new term to take account of increasingly widespread bigotry — that it is a sad and troubling development. Such is the case with 'Islamophobia'.

Islam online প্রচারিত Islamophobia : A Challenge for us all শীর্ষক এক ইন্টারনেট রিপোর্টে মুসলিমদের প্রদত্ত সাড়া থেকে জানা যায় পশ্চিমা জগতের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এমনকি এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনেও মুসলিম পরিচিতির কারণে অনেককেই ইসলাম ফোবিয়ার শিকার হতে হয়।

কাজাখস্তানের প্রাক্তন প্রধান ধর্মযাজক পোপ জন পল এই ইসলাম ফোবিয়ার অভিশাপ থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার জন্য এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন।

www.bjilibrary.com

বিবিসি টেলিভিশনে প্রচারিত প্রোগ্রামে ২০০৫ সালের মার্চ মাসে জর্দানের রানী নূর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ঃ

> "What grieves me today, truly, is the fact that not only in the United States but also in Europe we've seen the rise, over the last few years, of Islamophobia" adding, "Muslim populations and the Muslim world has been increasingly, not decreasingly, viewed as a menace, as alien, as, perhaps, incompatible with Western societies and values. And I passionately believe that that is not true and that we have a great deal of work to do there".

The Rise of Islamophobia বিষয়ে Global Research এবং অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে ড. আমান্দ এবং ঘালী হাসান অস্ট্রেলিয়ায় ২০০৫ খৃস্টাব্দে সংঘটিত ক্রনুল্লা রায়টের জন্য সেখানে বিরাজিত ইসলাম ফোবিয়ার প্রতি দোষারোপ করেন।

ফ্রান্সে ইসলাম ফোবিক কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে সেখানের মসজিদে সন্ত্রাস, ভাংচুর এবং বর্বরোচিত কা ঘটানো হয় মর্মে সেখানকার এক ডাইরেক্টর Dalil Boubakeur প্রতিবেদন পেশ করেন।

বিবিসির খবর এবং Anti-Discrimination Commission Queensland এর পরিবেশিত তথ্যে ব্রিসবেনে মসজিদের মাঝে আক্রমনের ঘটনা সম্বলিত সেখানকার ইসলাম ফোবিয়া চিত্রিত হয়।

স্পেনীয় Ceuta শহরে এক মুসলিম স্যাংচুয়ারী পোড়ানোর ঘটনা The Guardian রিপোর্ট করে।

The Tennessean এবং News Channel 5 Network এর মাধ্যমে প্রচারিত তথ্য অনুযায়ী ২০০৫ খৃস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে পবিত্র কোরআনের পাতায় বিষ্ঠা মাখানো এমনকি কোরআন শরীফ অবমাননাকরভাবে পোড়ানো হয়।

University of Toronto News এ প্রকাশিত Canadian Council on American Islamic Relations এক মুসলিম মহিলার উপর ইসলাম ফোবিয়া জনিত আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানায়।

UN News Center এ পরিবেশিত তথ্যে বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বিষয়ে এবং সাম্প্রতিক কালের সংবেদনশীল কার্টুন প্রকাশের প্রেক্ষিতে সতর্কতা অবলম্বন প্রতিবেদনে ইসলাম ফোবিয়া পরিদৃষ্ট হয়।

ফ্রান্সের পার্লামেন্টে হিযাব ব্যান করায় সেখানকার মুসলিম পার্টি প্রধান এ বিষয়ে সমালোচনা করেন এবং বলেন, এই আইন ইসলামফোবিয়া প্রতিষ্ঠিত করবে।

www.bjilibrary.com

Islamic Human Rights Commission বৃটেনের জেলখানায় ইসলাম ফোবিয়া বিষয়ে এক প্রেস রিলিজ প্রকাশ করে।

বৃটেনের পামস্টেড মুসলিম কাউন্সিল গোরস্থানে পরিচালিত ধ্বংসাত্মক কর্মকা ইসলাম ফোবিয়ার এক জঘন্যতম ঘটনা ।

দি মুসলিম এসোসিয়েশন অব ব্রিটেন লন্ডনের Forest Gate Anti Terror Raid-কে ইসলাম ফোবিক কর্মকা আখ্যায়িত করে এই রেইডের অপকর্মের জন্য পুলিশ প্রধানের পদত্যাগ দাবী করে।

বিবিসি নিউজে ডাচ পার্লামেন্টে বোরকা ব্যান করার প্রস্তাবকেও ইসলাম ফোবিক ঘটনা হিসেবে তুলে ধরা হয়।

ওআইসির সদস্য দেশগুলো থেকে জার্মানীতে নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্তকারীদের সরবরাহকৃত প্রশ্নমালায় হোমো-সেক্সুয়ালিটি, এবং ধর্মীয় ইস্যুভিত্তিক কতক স্পর্শকাতর বিষয়ের তথ্য পেশ করতে হত। 'দি মুসলিম নিউজ' এসবকে ইসলাম ফোবিক হিসেবে চিহ্নিত করে।

কাউন্সিল অন ইসলামিক রিলেসনস Ann Coulter এর পরিবেশিত উস্কানিমূলক তথ্য 'Muslims Smell Bad'-কে ইসলাম ফোবিক ঘোষণা করে।

বার্মিংহামে বৃটিশ ন্যাশনাল পার্টি ইসলাম ফোবিয়ার বিস্তার সাধন করে সেখানকার ভোট প্রভাবিত করে এ বিষয়ে 'দি ইনডিপেনডেন্ট' এ Oliver Duff তথ্য পরিবেশন করেন ।

ইউরোপে দি গার্ডিয়ান সহ অন্যান্য ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ইটালিয়ান জার্নালিস্ট Oriana Fallaci এর লিখা 'The Force of Reason' ইসলাম ফোবিক এবং মুসলিমদের প্রতি দারুণ ঘৃণা সঞ্চারক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

ইউ এস এটর্নী জেনারেল John Ashcroft এর উক্তি "ইসলাম এমন এক ধর্ম যেখানে আল্লাহ চায় তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যেন তোমরা তোমাদের সন্তানদের তাঁর উদ্দেশ্যে পাঠাও জীবন উৎসর্গ করার জন্যে। অপরপক্ষে কৃশ্চিয়ানিটি এমন এক বিশ্বাস যেখানে মনে করা হয় যে ঈশ্বর নিজে স্বীয় পুত্রকে পাঠিয়েছিল তোমাদের জন্যই মৃত্যুবরণ করতে"– এই উক্তির জন্য ২০০৩ খৃস্টাব্দের বার্ষিক ইসলাম ফোবিক পুরস্কারে তাকে ভূষিত করা হয়।

২০০৪ এবং ২০০৫ খৃস্টাব্দের ইসলাম ফোবিক পুরস্কার পায় Daniel Pipes। তাকে আমেরিকার একজন মারাত্মক আরব ও ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে Islamic Human Rights Commission এবং Creative Loafing Atlanta এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

২০০৬ সালে Jewish Week ফিলিপ ডিউইন্টার (Filip Dewinter)-এর রাজনৈতিক দর্শনকে এক সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করে যা ইসলাম ফোবিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত।

www.bjilibrary.com

বৃটেনের মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে যুক্তরাজ্যের মন্ত্রী Peter Hains এর উক্তি এবং ইটালির প্রধানমন্ত্রী Silivo Berlusconi এর বর্ণনা 'পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলামের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী' এই সবকিছুই ইসলাম ফোবিক প্রচারণা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ইসলামফোবিয়া বিষয়ক সমালোচনা (ভিন্নদৃষ্টি)

কতক সমালোচক যুক্তিতর্ক পেশ করতে চায় যে ইসলাম বা মুসলিমদের কর্মকাে র বিষয়ে সমালোচনাকে ইসলাম ফোবিয়া আখ্যায়িত করে এর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা কিংবা সেটা খুঁত খুঁতে প্যাথলোজিক্যাল এবং বিচার বোধহীন কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা সঠিক নয়। এক্ষেত্রে The Guardian পত্রিকায় প্রকাশিত বৃটেনের উদারপন্থী নারীবাদী জার্নালিস্ট ইসলামফোবিস্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত Polly Toynbee এর বর্ণনা সম্বলিত ধর্মীয় রাজনীতির কারণে ক্ষত-বিক্ষত ভারত, কাশ্মীর, উত্তর আয়ারল্যান্ড, শ্রীলংকা, সুদানসহ লম্বা তালিকার জনপদের অনেক ঘটনা উল্লেখ আছে। তাতে বর্তমান বিশ্বের বিপর্যয় ও বিপদের অন্যতম মূল কারণ হিসেবে ইসলামপন্থী মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব রাষ্ট্রে মৌলিক মানবীয় অধিকার অস্বীকার করে বর্বর দুঃশাসন চাপানোর জন্য ইসলামী সরকারকে দায়ী করা হয়েছে।

Religious politics scar India, Kashmir, Northern Ireland, Sri Lanka, Sudan... the list of countries wrecked by religion is long. But the present danger is caused by Islamist theocracy... There is no point in pretending it is not so. Wherever Islam either is the government or bears down upon the government, it imposes harsh regimes that deny the most basic human rights.

নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মী Bahram Soroush ইসলাম ফোবিয়াকে Intellectual Blackmail হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে কতক আতংকবাজ লোক ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ক যৌক্তিক সমালোচনা এড়ানোর লক্ষ্যে এহেন আতংক ছড়ায়।

বৃটিশ লেখক Kenan Malik এর রচিত The Islam Phobia Myth এর মাধ্যমে ইসলাম ফোবিয়ার অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করে কিছু তথ্য ও বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য দি মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন এর পক্ষে Inayat Banglawala সেইসব পরিবেশিত তথ্য চ্যালেঞ্জ করে Kenan Malik এর ধারণার প্রতিবাদলিপি দি গার্ডিয়ান পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। বিবিসির এক সার্ভের বরাত দিয়ে তাতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রথাগত ইংরেজ নামের চাকুরী প্রার্থীরা তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতা সম্পন্ন হলেও তাদের মুসলিম নামের প্রার্থীদের তুলনায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য করা হয়ে থাকে।

নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রফেসর Wolfram Richter এর লেখা The Next

www.bjilibrary.com

Holocaust রচনায় ইসলাম ফোবিয়াকে মনুষ্য সমাজের বিভাজন নীতির অন্য এক ধারা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

Islam Online এ প্রকাশিত এবং জাতিসংঘের দায়িত্বে আয়োজিত "Confronting Islam Phobia : Education for Tolerance and understanding" শীর্ষক এক সেমিনারে মিশর সরকারের প্রাক্তন এক সদস্য Ahmed Kamal Aboulmagd Ph.D. ইসলাম ফোবিয়ার নব্য প্রয়োগের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করেন এবং এই বিষয়টিকে মর্যাদাহানিকর বলে আখ্যায়িত করেন।

ডাচ দার্শনিক এবং ক্রিমিনাল আইনের বিশেষজ্ঞ Afshin Elian তার Stop Capitulating to Threats শীর্ষক রচনায় উল্লেখ করেন যে ইসলাম ফোবিয়া এবং বর্ণবাদী নীতির কারণে মুক্তভাষণ ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত ও সংকুচিত হয় এবং বুদ্ধিজীবীরা এর ফলে একান্ত বাধ্য হয়ে দাশখত দিয়ে মৌলবাদী সমাজে অপদস্থ ও আত্মসমর্পিতভাবে জীবন যাপন করে। তাই প্রকাশক, শিল্পী, মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজকে এর প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা নিয়ে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবতাবাদী দার্শনিক Piers Benn এর মতে যারা ইসলাম ফোবিয়া সম্প্রসারণের ভয় করে তারা বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতার মাপে কোন সুস্থ পরিবেশ লালন করতে ব্যর্থ হয়। এই ইসলাম ফোবিয়ার ভীতি ক্রমশঃ ইসলামের সংকটপূর্ণ নিরাপত্তার অন্তর কুঁরে কুঁরে তাকে ভিত্তিহীন করে তোলে। ধর্মের প্রকৃত রূপ ও অবস্থাকে অযুক্তিযুক্ত, অনুপযোগী ও অহিতকর হিসেবে প্রকাশ করে। ধর্মকে এর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞতায় জড়িয়ে ফেলে। যুক্তি ও জ্ঞানের চর্চার পরিবর্তে শুধুমাত্র আবেগতাড়িত হয়ে অথবা ভ ামির সাথে অজ্ঞতা, গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা ও ফোবিয়ার আশ্রয় নিয়ে যেভাবেই হোকনা কেন তার সকল দাবীকে সঠিক দেখে। এর ফলে বিশ্বাসের নড়বড়ে ভিত্তিতে ধস নামে।

দি নিউ ক্রাইটেরিয়ান পত্রিকার সম্পাদক Roger Kimball তার After the Suicide of the West শীর্ষক রচনায় Benn এর চিত্রিত ইসলাম ফোবিয়াকে সমর্থন দেয়। ইসলাম ফোবিয়াকে কোন অযৌক্তিক ভীতি মনে না করে বরং কতকটা স্বতঃসিদ্ধ বা অবশ্যম্ভাবী ভীতিকর অবস্থা বলে বিশ্বাস করে যা মৌলবাদী ইসলাম থেকে আরোপিত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে সে নিজেও প্রায়শঃই এই ভীতি উপলব্ধি করে।

ইসলামফোবিয়া বিষয়ক প্রকাশনা ও ওয়েবসাইট

৯/১১ ঘটনার পর থেকে ইসলামের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত এবং এর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ এমনকি সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর ঘটনাসমূহ গভীর উদ্বেগ সহকারে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রকাশনার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

www.bjilibrary.com

September 11th and the Mandate of the Church

Attack on US–One Christian's Response...

Message from an Arab Christian

Thoughts on the World Trade Center atrocity

A Time for Peacemaking or A Time for War?

Operation Infinite Mercy

Steadying the Soul While the Heart Is Breaking (by Ravi Zacharias)

Are we really strong? (by a Russian Christian)

Message to Muslims

www.the religion of peace.com ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত "Islamic Terror" এর বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে ইসলাম ফোবিয়া প্রতিষ্ঠিত করছে। এসব প্রতিবেদনের কিছু তালিকা নিম্নরূপ ঃ

Islam: More than a Religion

Does Islam Promote Peace?

The Cart Before the Horse: Terrorism and violence in Islam

Islamic Martyrdom: The Economy of Death in the Quran

The Root of the Problem

The Two Faces of Islam

Is Islam a peace-loving Religion?

The Myth of Islamic Tolerance

Islam and Violence

Jihad: The Teachings of Islam from its primary sources–the Qur'an and Hadith

The Koran's 150 Jihad Verses

Jihad in Islam: Is Islam Peaceful or Militant?

The Islamic Agenda and its Blueprints

Fatwa (legal ruling) by Usama bin Laden et. al.: Kill all Americans Everywhere

Top ten reasons why Islam is not the religion of peace

Index to Islam: TERROR

Islam: Spread by the Sword?

www.bjilibrary.com

Muhammad, Islam, and Terrorism and America, Islam, Jihad, and Terrorism

Do the Authentic Teachings of Islam Result in Terrorism? ([Part 1], [Part 2])

America, Muslims and Torture

The Islamic Concept of Peace

Jihad (from T.P. Hughes' Dictionary of Islam)

CAIR Founded by "Islamic Terrorists"?

Assessing Sept 11–Paradigms in conflict

Islam and Terror–Some Thoughts after 9/11

Open Letter to the Muslims in the U.S.

Understanding Islam in the Light of the Attack on the World Trade Center and the Pentagon (by Dr. Labib Mikhail)

"Yes Amrozi, we do remember Khaibar" (on the Bali Bomber)

Radical Islam at War With America

Hijacking Islam

IslamicTerror.com? –Muslim websites in West defend bin Laden, call for '5th column'

Islamic Charity Organizations: Alms & Terrorism

Politics & Islam's Brotherhood

The Mind of an Islamic Terrorist

Islamic Law & its Challenge To Western Civilization

Some reflections on Jihad and other issues

International Terrorism and Immigration Policy

Challenge to moderate Muslims

An open letter to moderate British Muslims

Where is the Gandhi of Islam?

Violence in the Bible and the Qur'an: A Christian Perspective

Converging Destinies: Jerusalem, Peace and the Messiah

The Kingdom of Peace

Terrorist Attacks in the US: *Preventable?*

www.bjilibrary.com

মডারেট ইসলাম বনাম মিলিট্যান্ট ইসলাম

ইসলাম ফোবিয়ার ফলশ্রুতিতে খৃস্টান সমাজে Ecumenist/Civilizationist হিসেবে দুটি পৃথক চিন্তাধারা সম্বলিত গ্রুপ মূলতঃ একই উদ্দেশ্য সাধনে ইসলামের বিরুদ্ধে কর্মতৎপর রয়েছে। প্রথম গ্রুপের নেতা Daniel Pipes এর চিন্তা হচ্ছে যে, র‍্যাডিক্যাল/মিলিট্যান্ট ইসলাম জনিত সৃষ্ট সমস্যার মুকাবিলায় মডারেট ইসলাম চালু ও প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে উত্তম সমাধান। তার বিশ্বাস যে মিলিট্যান্ট ইসলাম, এর মুকাবিলায় অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের তৎপরতা আদৌ বরদাশত করে না। এই টোটাল্যাটিরিয়ান মতবাদ পশ্চিমা জগতের সভ্যতাকে উস্টিয়ে বিশ্বজুড়ে পুরানো ইসলামের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে মরিয়া হয়ে চরম তৎপরতা শুরু করেছে। অথচ গতানুগতিক মডারেট ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই জঙ্গীদেরকে জব্দ করে বাকী সকল ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। Harvard Magazine-এ প্রকাশিত এ সংক্রান্ত Dr. Pipes এর মন্তব্য নিম্নরূপঃ

It's a mistake to blame Islam, a religion fourteen centuries old, for the evil that should be ascribed to militant Islam, a totalitarian ideology less than a century old. Militant Islam is the problem, but moderate Islam is the solution.

Militant Islam derives from Islam but is a misanthropic, misogynist, triumphalist, millenarian, anti-modern, anti-Christian, anti-Semitic, terroristic, jihadistic, and suicidal version of it. Fortunately, it appeals to only about 10 percent to 15 percent of Muslims, meaning that a substantial majority would prefer a more moderate version.

পশ্চিমা সভ্যতাকে জিইয়ে রাখার স্বার্থেই তাই তারা গোটা উম্মাহকে আজ র‍্যাডিক্যাল ইসলাম ও মডারেট ইসলামের বিভাজনে সহায়তা করে যাচ্ছে। একদিকে যেমন চরমপন্থী জঙ্গীদের অপতৎপরতাকে ইন্ধন যুগিয়ে ইসলামের গায়ে কালিমা লেপন করছে; অন্যদিকে তারাই আবার পরিকল্পনা মাফিক মডারেট ইসলামকে সংগঠিত করে তুলছে। এরপর তাদের আর্থিক প্রয়োজন, প্রচারণা ও মিডিয়া সমর্থন যুগিয়ে তাদের মাঝে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করছে। রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিকভাবে তাদের স্বীকৃতি দান ও মদদযোগানো হচ্ছে। তাদের মাধ্যমে ইসলাম বর্জিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে গ্লোবালাইজেশন করছে পাশ্চাত্যের সবকিছু। এমনিভাবে তারা আফগানিস্তানে প্রথমে তালেবানদের মাধ্যমে চরমপন্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। নিজেদের স্বার্থ মিটিয়ে নিয়ে তারাই এখন আবার কারজাই সরকারের মাধ্যমে মডারেট ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছে। একই ঘটনা তারা ইরাকে ঘটিয়েছে গণতান্ত্রয়নের নামে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত এক সরকার ইসলামের অন্যতম এক কেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে। ইরানেও অনুরূপ কায়দায়

www.bjilibrary.com

মডারেট ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার চরম পাঁয়তারা চলছে। এভাবে তারা মডারেট ইসলাম ও জঙ্গি ইসলামের মাঝে সংঘর্ষ বাধিয়ে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বে বিজয়ী হবার পরিকল্পনা নিচ্ছে ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যা কিছু মডারেট ইসলাম হিসেবে চালু করা হচ্ছে তার ফলশ্রুতিতে ইসলামের মাঝে প্রাণ আর কতটুকু বাকী থাকে? কেননা কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তবায়ন ছাড়া সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার আচরণ, সামাজিকতা ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে মুসলিম হিসেবে আদৌ কি টিকে থাকার সুযোগ থাকে? ঈমান পরিত্যাগ করে আহলে কিতাবের বাইরে অমুসলিমদের সাথে বিয়ে-শাদী চালু করে, ইসলামী শরীয়া ও রীতিনীতি বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ আইনের প্রবর্তনের মাধ্যমে আদৌ কোন ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় কি? এসব সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে একজন তথাকথিত মডারেট মুসলিমকে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম আখ্যায়িত করা যাবে কি? মডারেট মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য ডঃ পাইপসের নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর ইতিবাচক জবাব দেয়া কোন প্রকৃত মুসলিমের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

Should non-Muslims enjoy completely equal civil rights with Muslims? May Muslims convert to other religions? May Muslim women marry non-Muslim men? Do you accept the laws of a majority non-Muslim government and unreservedly pledge allegiance to that government? Should the state impose religious observance, such as banning food service during Ramadan? When Islamic customs conflict with secular laws (e.g., covering the face for drivers' license pictures), which should give way?

If one sees Islam as irredeemably evil, what comes next? This approach turns all Muslims—even moderates fleeing the horrors of militant Islam—into eternal enemies. And it leaves one with zero policy options. My approach has the benefit of offering a realistic policy to deal with a major global problem.

একক ব্যক্তি হিসেবে কেউ চাইলে হয়ত ইসলাম পরিত্যাগ করতেও পারে—এমন নযির রয়েছে। তেমনিভাবে তুরস্কের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী দেশেও অতীতে অনৈসলামী করণের ব্যাপক তৎপরতা চালানো হয়েছে। কিন্তু ডঃ পাইপসের কল্পিত মডারেট ইসলাম কোথাও টিকতে পেরেছে কি?

Militant Islam Reaches America শীর্ষক এক নিবন্ধে ডঃ ডানিয়েল পাইপস গতানুগতিক (Traditional) ইসলাম এবং ইসলামিজম (Modern Islam) নিম্নরূপে চিত্রিত করেছেন ঃ

While Islamism is often seen as a form of traditional Islam, it is some-

www.bjilibrary.com

thing profoundly different. Traditional Islam seeks to teach humans how to live in accord with God's will, whereas Islamism aspires to create a new order. The first is self-confident, the second deeply defensive. The one emphasizes individuals, the latter communities. The former is a personal credo, the latter a political ideology.

The mentality of *radical Islam* [emphasis added] includes several main components, of which one is Muslim supremacism—a belief that believers alone should rule and otherwise enjoy an exalted status over non-Muslims. This outlook dominates the *Islamist* [emphasis added] worldview as much in the elegant streets of Paris as in the rude caves of Afghanistan.

Lawrence Auster এর The Search for Modern Islam প্রবন্ধে পাইপসের মডারেট ইসলাম ধারণার তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে ট্রাডিশনাল ইসলাম (Moderate or Good Islam) কে মডার্ন ইসলাম (Islamism or militant Islam) থেকে আলাদাভাবে দেখানোর মাধ্যমে ইসলামের প্রায় দেড় হাজার বছরের চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে একদম উপেক্ষা করা হয়েছে বলে। এমনকি সকল মতবাদ, ধর্ম ও বিশ্বাসের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী সংশ্লিষ্ট সৃষ্ট জটিলতাসমূহকেও কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পাইপস ট্রাডিশনাল ইসলামের কোন আগ্রাসী, স্বৈরাচারী, আধিপত্যবাদী, গণ বিধ্বংসী এধরনের চেহারা তুলে না ধরার কারণে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

Pipes cannot wholly deny that jihad is the core of Islam, since that would be a lie, nor can he admit it, since that would mean that Islam is unreformable.

However, we now understand that whatever Pipes's reasons may be, his absolute distinction between "radical" and "moderate" Islam is not true. While Islamism is certainly more toxic and murderous than traditional Islam, both have messianic elements, both appeal to the Koran as their ultimate source of authority, and neither can shed its jihadism in any principled and permanent way. Savage killings and beheadings of innocent non-Muslims did not begin in Iraq in 2004, but go back to Muhammad's days in Medina, when he carried out the treacherous and homicidal acts against his enemies (including mere critics) that became a paradigm of Muslim conduct toward unbelievers for all ages to come. Islamism—the modern, fascist-inspired version of the faith—may be new, but Islamic militancy is 1,400 years old.

www.bjilibrary.com

এই পরিপ্রেক্ষিতে সিভিলাইজেশনিস্টরা ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে বাস্তবে জড়িত বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মাঝে বিদ্যমান অমার্জনীয় অসঙ্গতিসমূহ তুলে ধরে এই দুই সভ্যতার মাঝে সম্মুখ টক্কর অপ্রতিরোধ্য হিসেবে প্রকাশ করে। ইসলামের সাথে আপোষ, সমঝোতা কিংবা সহযোগিতাকে তারা আত্মহত্যার সামিল মনে করে। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরআন—তারা যতক্ষণ না ইসলাম কবুল করে, যুদ্ধ করে যাবার জন্য মুসলিমদের নির্দেশ দেয়। সামগ্রিকভাবে ইসলামী শরীয়া যতক্ষণ না বিজয়ী হয় এবং অমুসলিমরা বিনীত, অনুগত অবমাননাকর জিম্মি হিসেবে আত্মসমর্পণ করে, তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা আরও বলে যে স্থান, কাল কিংবা অন্য কোন প্রেক্ষিতেই ইসলামের কোন সংস্কার করা সম্ভব নয়। যেহেতু এর বিশ্বাসের কেন্দ্র হচ্ছে কুরআন আর সেই গ্রন্থে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; ইহুদী, খৃস্টান ও ধর্মত্যাগীদের মৃত্যুদে র বিধান দেয়া হয়েছে; ব্যভিচারীকে পাথর মেরে মারতে এবং চোরের হাত কাটতে বলা হয়েছে—এই কুরআনকে বদলানোর কোন কর্তৃত্ব কাউকেই দেয়া হয়নি। তাই মডারেট ইসলামের প্রবক্তাদের যুক্তি মৌলবাদীরা কোনভাবেই মেনে নেবে না।

উদাহরণস্বরূপ প্রায় এক দশক ধরে রেজা শাহ পাহলভী ইরানের আধুনিকায়ন করা সত্ত্বেও ১৯৭৯ সালে তার পতনের কয়েক মাসের মধ্যেই সেখানে শরীয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই কারণে তুরস্ক আশি বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ও শাসন ব্যবস্থার অধীনে থাকা সত্ত্বেও সেখানে সম্প্রতি পুনরায় ইসলামী আইন কার্যকর হচ্ছে। মডারেট আরব হিসেবে খ্যাত মিশরেও গোঁড়া মোল্লা ও জিহাদী গ্রুপের ব্যাপক তৎপরতার খবর প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও খোদ পশ্চিমা জগতে তাদের বংশোদ্ভূত পশ্চিমা সভ্যতায় গড়ে উঠা অনেক মহিলা ইসলামের মাঝে এসে হঠাৎ করে হিযাব গ্রহণ করে এবং গর্বের সাথে ঘোষণা দেয় তার বর্তমান ও প্রকৃত স্বরূপ। পুরুষেরাও যারা বদলাচ্ছে তারা র‍্যাডিক্যাল ইসলামকেই গ্রহণ করছে। এই প্রেক্ষাপটে সিভিলাইজেশনিস্টরা কোনভাবেই ইসলামের মডার্ণ, ট্রাডিশনাল কিংবা মডারেট কোন রূপকেই মেনে নিতে পারছে না। কাঙ্ক্ষিত মডারেট ইসলামের প্রতীক্ষার ব্যাপারে Lawrence August ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মাঝে দীর্ঘকালের শান্তি প্রচেষ্টার উদাহরণ দিয়ে কতকটা ধৈর্যচ্যুত হয়ে বলেন ঃ

Israel's decades–long quest for peace with the Arabs, fueled by the repeatedly dashed, repeatedly renewed hope that a "moderate" Arab leadership would somehow emerge that would endorse Israel's right to exist.

The Palestinian leadership, corresponding in our analogy to the jihadist core of Islam under its "moderate" clothing, never wanted peace on terms that were compatible with Israel's survival.

www.bjilibrary.com

Instead of spending our energy building up our own society and culture, which is within our power to do, we would be attempting to build up the *Muslims'* society and culture, which is not within our power to do. We would be gambling our freedom and survival on the chance that we can bring something into existence that has never existed. We would be making our safety contingent on whether the moderate Muslims can be what *we* want them to be. We would keep gazing expectantly at each Muslim as a potential moderate, and averting our eyes when he turned out not to be one—just as the leaders of Israel and the U.S. kept closing their eyes to the real nature of the Palestinians for all those years and are *closing them still.* We would have to keep refusing to acknowledge failure.

Like the Marxist dream with its 150 years on the road to nowhere, our dream of a moderate Islam will inevitably collapse one day, and the price might be nearly as high.

Mark Goldblatt এর লেখায় বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্বেষায় ইসলামে জিহাদের হুকুমকে পরাস্ত করার জন্য এমনই এক গ্রুপ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝ থেকে সেই উদ্দেশ্যে উত্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইসলামের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ইরাকে বুশ প্রশাসন এক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবে যা মডারেট মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করে র‍্যাডিক্যাল ইসলামকে চিরতরে ঠাণ্ডা করে দেবে। যদি এই পরিকল্পনা কার্যকর না হয়, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী এর পরেও র‍্যাডিক্যাল ইসলাম বর্জনে অনুপ্রাণিত না হয় তখন "Hobbesian" Scenario এর অবতারণা ঘটবে। আগে পরে যখনই হোক যুক্তরাষ্ট্র এই লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন অংশে আঘাতের পর বহু আঘাত হানতেই থাকবে যতক্ষণ না কোন আকস্মিক বিপত্তি/বিপর্যয় এসে না পড়ে। আমেরিকার জনগণের তখন এই প্রেক্ষিতে মুসলিমদের পাইকারী গণহত্যা সাধনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না বরং তারা এ বিষয়ে অতুলনীয় সাড়া দেবে। তারা এমন এক সরকার নির্বাচিত করবে যা চিরতরে যে কোন মূল্যে অযুত মুসলিম নিধন করে হলেও ইসলামের দাপট ও ভীতির অবসান ঘটাবে।

১৯৪৫ সালে জাপান ও জার্মানীদের যেমন শোচনীয়ভাবে দমন করা হয়েছিল– উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে পারস্য উপসাগর এলাকা হয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমগ্র মুসলিম জাহানে তেমনি এক অবমাননাকর পরাজয়ের গ্লানি চাপানো হবে। যাতে তারা যথার্থভাবে টের পায় যে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মৌলবাদী জিহাদ একদম মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন পাশ্চাত্যের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে বাকীরা নিজেদের মাঝ থেকে সন্ত্রাসের ক্যান্সারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে।

www.bjilibrary.com

Hobbesian এর প্রস্তাবিত এই নীলনক্সার প্রতি সমর্থন জানিয়ে Lawrence Auster বরং মুসলিমদের তাদের নিজ বাসভূমিতে প্রত্যাবাসনে বাধ্য করার পরামর্শ দেন ঃ

I suggest of forcing and encouraging western muslims to move back to their home country and isolating them there where they can't harm us.

বুশ সমর্থক ওয়েবসাইট Lucianne.com মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে আসছে। পাশ্চাত্যে মুসলিমদের ইমিগ্রেশন বন্ধ করা, সেখানকার ওয়াহাবি মসজিদসমূহ বন্ধ করা কিংবা সেখানকার জিহাদী সন্ত্রাসীদের প্রত্যাবাসন করার বিষয়টি অনেকটাই অকল্পনীয় এবং এ বিষয়ে কেউই তেমন কিছু বলে না। কিন্তু মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে প্রবল উদ্দীপনা সহকারে রক্তক্ষয়ী গণহত্যা চালানো এখন সেখানে আদৌ অবাস্তব নয়।

Universalists cannot imagine radically different civilizations residing and flourishing in distinct spheres. They can only imagine a single global system formed by a single set of democratic ideas. A culture permanently hostile to democracy or to America defeats, by its very existence, the universalist idea. The only way to defend the idea from such a recalcitrant culture would be to annihilate it.

The consequences of our seeking peace with Islam will be disarray and distraction on our side, surging confidence and aggression on the Muslim side, renewed major terrorist attacks by Islamists against us, and the punitive killing by us of hundreds of thousands or perhaps millions of Muslims—after which, according to Goldblatt, we will become responsible for rebuilding the Muslim world.

Eurabia এবং The Decline of Eastern Christianity Under Islam এর লেখক সমালোচনার মাধ্যমে মুসলিমদের জিহাদী বিশ্বাসকে প্রতিহত করা সম্ভব না হলে মুসলিমদের অনন্যোপায় অবস্থায় ফেলে তাদের মডারেট হতে বাধ্য করার পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ পেশ করেছেন।

We must stop closing our eyes to the reality of jihad, stop blaming ourselves for Muslim terrorism, and stop imposing crippling taboos on our own speech. Instead, we must openly discuss the Muslims' jihadist beliefs, both among ourselves and with the Muslims. This would force them to face the truth about themselves, which in turn might bring about a positive alteration in their outlook and demands. Muslims cannot change themselves. We must help them do it—or rather, we

www.bjilibrary.com

must put them in a position where they will have no choice but to moderate their own attitudes and behavior toward us.

Therefore, as long as Islam exists, the only solution to the problem of Islam is to keep the Islamic world in a powerless condition, as it had been through all of modern times until 1979. Western criticism of and confrontation with Islam must be permanent.

Mark Helprin আমেরিকার সামরিক শক্তির সম্প্রসারণসহ মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য উপসাগরীয় এলাকা কিংবা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্ট্রাটেজিক জোনে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের পরামর্শ দিয়ে বিশ্বের মুসলিম নেতাদের এই বোধোদয় করাতে এবং হুঁশিয়ার করে দিতে বলেছেন।

The purpose of his strategy is not to reform or democratize the internal politics of terror-supporting Muslim societies, as President Bush and the neoconservatives seek to do, but to make militant Muslim leaders realize that they have no hope of harming us and that they face the loss of their regimes and their lives if they try.

Angellocodevilla মুসলিম নেতৃত্বের বিনাশ সাধন কিংবা তাদের গৃহপালিত দুশমনের মত করে আনুগত্যের মাঝে জিইয়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

Lawrence Auster তার পরামর্শের উপসংহার টেনে বলেন ঃ

The aim of my plan is not to reform the Muslims, i.e., to "assimilate" them to our way of life, but to confront them and diminish their power. Those policies will have the effect of encouraging the reduced U.S. Muslim population to adapt themselves more to our society, or choose voluntarily to leave.

Whatever the specific proposal may be, the basic civilizationist idea is to speak the *truth* about Islam, to *confront* Islam, and to *contain* Islam. It is to initiate a net out-migration of Muslims from the West and to isolate the Muslim world in its historic lands. It is to restore the Realm of Islam to the powerless and quiescent condition in which it resided during the early modern period. We of the West, along with other non-Muslim peoples, cannot be safe co-existing in this world with Islam, unless Islam has no ability and opportunity to affect us.

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলাম ফোবিয়ার প্রভাব

এদেশের সাধারণ জনগণের মাঝে ইসলামের সঠিক জ্ঞানের দারুণ অভাব রয়েছে। ইসলাম যারা অনুসরণ করে বলে মনে করে তারাও এর সামাজিক, অর্থনৈতিক,

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামের কোন মডেলের সাথে পরিচিত নয়। তাই বিভিন্ন মহল কর্তৃক বহু ভুল ও বাড়াবাড়ি সহ অনেক ধারণা ও ধর্মীয় চেতনা সমাজে চাপানোর একটা প্রবণতা রয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে এহেন বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার কারণে সাধারণের মাঝে কিছুটা হলেও ইসলাম ফোবিয়া জায়গা করে নিয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড় ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির এক মারাত্মক কুফল বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম ফোবিয়ার প্রতিক্রিয়া এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মকাে ধরা পড়ে।

এদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পশ্চিমা চেতনায় উদ্বুদ্ধ। ইসলামী কালচার ও বাংগালী কালচারের মাঝে বৈপরীত্য তুলে ধরে এর বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলাম ফোবিয়া প্রসারে তারা সচেষ্ট।

বিদেশী প্রভুদের বশ্যতার মাঝে গড়ে উঠার কারণে এদেশের অফিস আদালত ও প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে কেমন যেন একটা প্রভু-ভৃত্যের চেতনা আটকে রয়েছে। প্রভাবশালী বস কিছু মনে করে এমন ভয়ে ইসলামী চেতনা ও ইসলামী মুয়ামেলা সম্পর্কে উচ্চ প্রশাসনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোন না কোন ধরনের ইসলাম ফোবিয়া ক্রিয়াশীল।

সৎপথে অগ্রসর হলো কোন ঈপ্সিত কার্যোদ্ধার করা সম্ভব হয়না। এই ধারণার সত্যতা বাস্তবে বিরাজিত হওয়ায় এদেশের অনেক ব্যবসায়ী রাতারাতি বৈষয়িক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামকে এড়িয়ে চলার মত একটা বিষয় মনে করে। বাস্তবে ব্যবসা ক্ষেত্রের অনিয়ম, দুর্নীতি, মজুদদারী সিন্ডিকেট, ভেজাল, সন্ত্রাস, লাঠিয়াল বাহিনী প্রতিপালন এমন অনেক কর্মকাে র সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট পরিমাণে ইসলাম ফোবিক।

মানবাধিকারবাদী আন্দোলনের নামে ইসলাম ফোবিয়ার প্রচার ও প্রসার ঘটছে।

সন্ত্রাসী, খুনী ও দাগী আসামীদের বিরুদ্ধে র‍্যাব-এর এনকাউন্টার, যৌথ বাহিনীর ক্লিনহার্ট অপারেশন এসবের মাঝেও তারা ইসলাম ফোবিয়ার ভূত দেখায়।

নারীবাদী আন্দোলনকারীরা তাদের বিভিন্ন তৎপরতার মাধ্যমে ইসলাম ফোবিয়া ছড়ায়।

ইন্দো-মার্কিন-ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টবৃন্দ এখানে ইসলাম ফোবিয়ার নাটের গুরু।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তারা এখানে ইসলাম ফোবিয়া সৃষ্টি করে।

আহমদিয়া সম্প্রদায়কে ফোবিয়ার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিদেশী কূটনীতিবিদরা এখানে ইসলাম ফোবিয়ার সহায়ক শক্তি।

কোন কোন রাজনৈতিক দল ইসলাম ফোবিয়ার প্রচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণ করে।

জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ ও অনুরূপ চরমপন্থীরা এদেশে ইসলাম ফোবিয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

ইমাম, মুয়াল্লিম, ওয়ায়েজ ও অনুরূপ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম পেশাজীবী মহলের সচেতনতার অভাব এবং উপযুক্ত ভূমিকা না থাকায় ইসলাম ফোবিয়া বিস্তার লাভ করছে।

অক্টোবর ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে নব্য রক্ষণশীলদের নেতৃত্বে পরিচালিত ক্রুসেডের অংশ হিসেবে বাংলাদেশবিরোধী আগ্রাসন চলতে থাকে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পিত কাহিনী দেশ-বিদেশে প্রচার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই মি. বারটিল লিন্টনার ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউয়ের প্রচ্ছদ কাহিনী হিসেবে A Cocoon of Terror প্রকাশ করে। বাংলাদেশকে জড়িয়ে নিম্নোক্ত এসব অলীক কল্প-কাহিনী ইসলাম ফোবিয়া উদ্রেক করে :

A revolution is taking place in Bangladesh that threatens trouble for the region and beyond if left unchallenged. Islamic fundamentalism, religious intolerance, militant Muslim groups with links to international terrorist groups, a powerful military with ties to the militants, the mushrooming of Islamic schools churning out radical students, middle-class apathy, poverty and lawlessness– all are combining to transform the nation.

(বাংলাদেশে এমন একটি বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, যা নিবৃত্ত করতে না পারলে ওই অঞ্চল এবং বহির্বিশ্বের জন্য সমস্যা তৈরি করবে। ইসলামী মৌলবাদিতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রে জড়িত বিদ্রোহী মুসলিম গোষ্ঠী, বিদ্রোহীদের সঙ্গে জড়িত শক্তিশালী সেনাবাহিনী, ব্যাঙের ছাতার মতো দ্রুত বিকাশমান ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জঙ্গি ছাত্ররা, উদাসীন মধ্যবিত্ত সমাজ, দারিদ্র্য এবং অরাজকতা মিলে জাতির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে)।

"In the immediate term, Bangladesh's secular tradition is most at risk from the rise in fundamentalism. Attacks on Hindus, who generally support the staunchly secular Awami League, are increasing. "The intimidation of the minorities, which had begun before the election, became worse afterwards," said The Society for Environment and Human Development, a local non-governmental organization, in a report on the October poll. An Amnesty International report concurred and indicated that members of the BNP-led coalition were responsible. But neighbouring India and Burma– which both have Muslim minorities–are also at risk, while the Western world cannot afford to be complacent either, analysts say."

www.bjilibrary.com

(মৌলবাদের উত্থানে স্বল্প মেয়াদে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য ঝুঁকির মধ্যে আছে। ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগের সাধারণ সমর্থক হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়ছে। একটি স্থানীয় এনজিও The Society for Environment and Human Development অক্টোবর নির্বাচনের ওপর তৈরি এক প্রতিবেদনে লিখেছে যে, 'নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘুদের প্রতি যে ভীতি প্রদর্শন শুরু হয়েছিল সেটা পরে আরো ভয়াবহ হয়েছে।' অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে এই অভিমতের সমর্থন রয়েছে এবং ইঙ্গিত করেছে যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের সদস্যরা এই কর্মকাণ্ডে জড়িত। বিশ্লেষকরা বলছেন, সংখ্যালঘু মুসলমান অধ্যুষিত প্রতিবেশী ভারত ও মায়ানমারও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং পশ্চিমা বিশ্ব এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে না।)

২০০৪ সালে এ ধরনের ইসলাম ফোবিক প্রচারণা আরো তীব্র এবং সমন্বিত রূপ গ্রহণ করে। ওই বছর জনৈক অরবিন্দ আগিদা টাইম ম্যাগাজিনে বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখেন State of Disgrace। এশিয়া টাইমস বাংলাদেশ সম্পর্কে লেখে 'The most dysfunctional country in Asia' এবং দি ইকোনমিস্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে যে নিবন্ধটি লেখে তার শিরোনাম ছিল 'Bangladesh: State of Denial.' ১১ জুন ২০০৪ সালে ইংরেজী দৈনিক ডেইলী স্টার পত্রিকার সম্পাদক তার 'ফেইল্ড স্টেস অ্যান্ড বাংলাদেশ' নিবন্ধে লিখেন,

'The way our country has been run in the last 13 years has not helped to strengthen our faith either in our state or in our future. On the contrary it has considerably eroded our faith in both.'

(যেভাবে আমাদের দেশ গত ১৩ বছর ধরে পরিচালিত হয়েছে, তাতে রাষ্ট্র কিংবা ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস শক্তিশালী হয়নি। বরং দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের বিশ্বাস ক্ষয়িত হয়েছে)। মতিউর রহমান ২৭ মে ২০০৪ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় লিখেন 'বাংলাদেশ কি একটি অকার্যকর রাষ্ট্র?'

বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, এক দুর্নীতিসূচক সর্বপ্রথম প্রকাশ করে ১৯৯৫ সালে; মি. হান্টিংটন তার সভ্যতার লড়াই লিখেন ১৯৯৩ সালে; সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে ১৯৯১ সালে; প্রেসিডেন্ট বুশের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শুরু হয় ২০০১ সালে। এদিকে আবার সুইজারল্যান্ডের ডাভোসভিত্তিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কিত সূচক প্রকাশ করে ২০০১ সালে। সময়ের বিবেচনায় এসব ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা মনে হতে পারে না কি? ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এবং তাদের স্থানীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিপিডি ক্রমাগতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক চিত্র উপস্থাপন করার জন্য। এসব তৎপরতার পিছনে ইসলাম ফোবিয়া কাজ করছে।

www.bjilibrary.com

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্যালেস্টাইনে হামাস, লেবাননে হিজবুল্লাহর বিজয় এবং ইরাকে শিয়ারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে বুশ প্রশাসনের ঘোষিত মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ার উৎসাহে সম্প্রতি দৃশ্যতই ভাটা পড়েছে। অথচ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের নির্বাচন ও রাজনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, টুইসডে গ্রুপ, ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া বিউটেনিস, অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার ডগলাস ফসকেট, তদনীন্তন ভারতীয় হাইকমিশনার বীনা সিক্রি, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়া-দু এবং জাতিসংঘের মহাসচিব বান-কি-মুন অযাচিতভাবে বরং ট্রেসপাস করে হস্তক্ষেপ করেছেন। এসব ঘটনার মাঝেও বহিঃশক্তির ইসলাম ফোবিক ষড়যন্ত্র কার্যকর রয়েছে।

বাংলাদেশ ইন্দো-মার্কিন-বৃটেনের গৃহপালিত অনুগত মুসলিম দেশ হলে এখানের গণতান্ত্রিক চর্চায় বহিঃশক্তির এতটা নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ ছিল না।

টাইমস ম্যাগাজিনে মুসলিমদের মৌলবাদী কট্টরপন্থী হিসেবে কটাক্ষ করে এলেক্স পেরী 'Deadly Cargo' শিরোনামে এক কল্পকাহিনী প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে শত শত আল কায়েদা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তালেবান যোদ্ধা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র, একে-৪৭ রাইফেল ও গোলাবারুদ সহ অনুপ্রবেশ করে বলে উল্লেখিত হয়। বাংলাদেশ আল কায়েদা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তালেবানদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এমন এক ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরা হয়।

Far Eastern Economic Reviewতে Beaware of Bangladesh শীর্ষক অনুরূপ আরও একটি ভয়াবহ কল্পকাহিনীর মাঝে বাংলাদেশে তালেবানী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার তথ্য পরিবেশিত হয়।

ইসলামফোবিয়ার কারণ সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসা ও অভিযোগ

ইসলাম ফোবিয়া আক্রান্তদের মৌলিক জিজ্ঞাসা এই যে, ইসলাম কি তবে শান্তির ধর্ম নয়? এটা মানব জীবনের সংঘাতময় ও বৈষয়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, সমাজ অর্থনীতি কিংবা রাজনীতির মতো নোংরা বিষয়? কুরআন শরীফকে যারা সাধারণ একটা ধর্মীয় গ্রন্থ, রাসূলকে ধর্মীয় নেতা হিসেবে তাজীম ও সম্মান করে থাকে এসব পবিত্র বিষয়াদি তারা জাগতিক নোংরামীর মাঝে টেনে আনার পক্ষপাতি না।

পশ্চিমা নীতি হচ্ছে 'মিথ্যা আনন্দদায়ক তাই তিক্ত সত্যের তুলনায় ভাল ও গ্রহণযোগ্য'। Peace with God দিয়ে বুঝায় যিশু তাদের শাস্তি নিজে গ্রহণ করেছে। তাদের পাপ পবিত্র আত্মা শোষণ করে নিয়েছে। তাই আনন্দদায়ক যা কিছু, তাদের গ্রহণ করায় কোন দোষ নাই। এমনটা ইসলামের বিধান না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই এটা তাদের রুষ্ট করে।

ইসলাম মসজিদ এবং রাষ্ট্রের মাঝে সম্পর্কহীন অবস্থা চায়না। তাওহীদ প্যারাডাইম ও একমাত্র মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা ইসলামের অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ

www.bjilibrary.com

বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন ধর্মের সাথে এসব চেতনা ও নীতির কোন মিল নেই। মৌলিক এসব নীতির অনুসারীদের ইসলাম ফোবিস্টরা তাই তীব্র সমালোচনা করে।

জিহাদ সংশ্লিষ্ট কুরআন শরীফের আয়াত সমূহের কারণে তারা কুরআনকে সন্ত্রাসীদের একটি গাইডবুক হিসেবে সমালোচনা করে। সুরা ঃ আয়াত, ৪ ঃ ৮৯, ৯৫, ১০১, ১০২, ১৭১; ৫ ঃ ১৪, ৩৪,৩৫, ৫১, ৮২; ৭ ঃ ১৬৬, ১৭৯; ৮ ঃ ১২, ৩৯, ৬০, ৬৫; ৯ ঃ ৫, ২৯; ৬০ ঃ ১; ৯৮ ঃ ৬ ইত্যাদি বহু আয়াতকে তারা সন্ত্রাস উদ্রেককারী ও অশান্তির কারণ হিসেবে তীব্র সমালোচনা করে।

মুসলিম মনীষীদের দারুল ইসলাম ও দারুল হারব এর ধারণার ভিত্তিতে ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

কুরআন, হাদীস এবং আল তাবাকাত আল কবীর কিতাবসমূহের কিছু রেফারেন্স দিয়ে রাসূলের কঠিন হৃদয় ও নিষ্ঠুর চরিত্রের বর্ণনা পেশ করা হয়।

ইবন কাসীর এর আল বিদায়াহ ওয়া আল নিহাইয়া, ভলিউম-৪, কা'ব বিন আশরাফ হত্যার অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস "ইহুদীদের যেখানে সুযোগ পাও হত্যা কর" এধরনের নির্দেশ কি সন্ত্রাস উৎসাহিত করেনা?

কিনানা'র হত্যা, ১২০ বছরের বৃদ্ধা আসমা বিনতে মারওয়ানের হত্যা, আবু আফাকের হত্যা, একচোখা এক রাখালের হত্যা, বিনতে মারওয়ানের হত্যা, এক দাসীর হত্যা ইত্যাদি অনেক বিষয় তুলে ধরা হয়। উম্মে কিরফাকে দুই উট দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে হত্যা কি ইসলামকে শান্তির ধর্ম প্রমাণ করে?

ইসলাম সম্প্রসারণের ইতিহাস এর প্রতিবাদকারী বিপরীত পক্ষকে শক্তি কিংবা তরবারি দিয়ে বশীভূত করার ঘটনায় ভরা– এমন ধরনের বহু উদাহরণ দেয়া হয়।

আলজেরিয়া, মিশর, তুরস্ক এবং ইন্দোনেশিয়ার মত দেশসমূহ শরীয়ার পুরো প্রয়োগ মেনে নেয়নি। যেমন তারা কেউই চোরের হাত-পা কাটা, মাদকাসক্তদের বেত্রাঘাত, ধর্মত্যাগীদের হত্যা, জানের বদলা জান, চোখের বদলা চোখ ইত্যাদি আইন কার্যকর করেনি। এতদ্সত্ত্বেও যারা এসব আইন প্রয়োগে বাড়াবাড়ি করে তাদের সন্ত্রাসবাদের হোতা হিসেবে দেখানো হয়।

স্ত্রীর বিছানা পৃথকীকরণ, স্ত্রী পেটানো, তালাক বলেই সম্পর্কচ্ছেদকরণ, বহুবিবাহ, পুরুষ ও স্ত্রীর মাঝে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বৈষম্য, দায়িত্ব ও সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বের তারতম্য ইত্যাদি বৈষম্যকে মানবাধিকারের লংঘন হিসেবে দেখানো হয়।

কোন মুসলিম মহিলাকে হত্যা করা হলে এর রক্তপণ (দিয়াত) বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ পুরুষদের জন্য প্রদেয় অর্থের অর্ধেক।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পূর্বের সন্তানদের উপর অধিকার পায়না।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং ঘরের বাইরে চলা ফেরার উপর বিধিনিষেধ আরোপ।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার খর্ব করা।

নবীদের প্রতি বিশ্বাস দ্বারা পূর্ববর্তী অন্যান্য সকল নবীর শিক্ষা ও উপদেশসমূহ মান্য করা আবশ্যকীয় হয়ে যায় বলে তাদের ধারণা। কিন্তু ইসলাম সকল নবীতে বিশ্বাসের কথা স্বীকার করলেও বাস্তবে তাদের উপদেশ ও শিক্ষার প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না।

৬৩৫ খৃস্টাব্দে হযরত উমারের (রাঃ) খিলাফাতের সময় আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদীদের বিতাড়িত করা আদৌ যৌক্তিক ছিল কি? এখন তবে ইসরাইলের দ্বারা ফিলিস্তিনীদের বিতাড়নে প্রশ্ন উঠে কেন?

সপ্তম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী শক্তির দেশের পর দেশ আক্রমণ যদি আগ্রাসন না হয় তবে আজ বুশের ইরাক-আফগানিস্তান কিংবা অন্য মুসলিম দেশ আক্রমণে দোষ কোথায়?

মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী এসব উৎসাহ কুরআন ৪ ঃ ৭৪, ৯ ঃ ১১১, ৬১ ঃ ১০-১২ এবং অনুরূপ বহু আয়াতে প্রদান করা হয়েছে। মৃত্যুর পরে এর বিনিময়ে তাদের হুর প্রদানের প্রলোভন দেয়া হয়েছে– যা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী পাক ভারত উপমহাদেশে এবং সাইয়েদ কুতুব মিশরে জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের জোরালো চেতনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে। ফলে মৌলবাদ মাথা চাড়া দেয়।

মুহাম্মাদ (সা) মক্কায় অবস্থানকালে ইসলামের প্রসার হয়েছিল কী? মদীনায় পলায়ন করে যখন তারা ব্যবসায়ী কাফেলার উপর সন্ত্রাসী আক্রমণ, যুদ্ধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাে লিপ্ত হয় এর প্রভাবে লোকেরা ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

এখনও বিন লাদেনের টুইন টাওয়ার আক্রমণ কিংবা লন্ডনের সন্ত্রাসী তৎপরতা অনুরূপভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণে উদ্দীপক কর্মকা হিসেবে সন্ত্রাস বৃদ্ধির সহায়তা করছে।

কুরআনের বিপরীতমুখী ব্যাখ্যা সম্বলিত আয়াতসমূহ তুলে ধরে তারা প্রশ্ন করে– এখন মুসলিমেরা এর কোনটা অনুসরণ করবে? যেমন ২ ঃ ২৫৬ "ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই"। কিংবা ১৫ ঃ ৯৪ "এখন থেকে তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের তৎপরতা উপেক্ষা কর"।

> এসবের বিপরীতে ৯ ঃ ৫ এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে "নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের বন্দী কর। অবরোধ কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁত পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তখন তাদের পথ ছেড়ে দাও।"

www.bjilibrary.com

এসব আয়াতের কোনটা অন্যটার বিধান রহিত করে এর ফয়সালা কি একেক জন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেয়ার সুযোগ পাবে?

মক্কী আয়াতসমূহে ইসলামকে যুদ্ধের মাঝে জড়ানোর নির্দেশ ছিল না। পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে সম্প্রসারণ ও আগ্রাসী তৎপরতা চালিয়ে গেছে। তবে কি পরবর্তীতে কুরআনের শান্তির বাণী রহিত করে আগ্রাসী ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর বিধান বলবত করেনি?

ইসলামফোবিয়ার প্রেক্ষিতে করণীয়

ইসলাম ফোবিয়ার প্রভাব এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য বিচক্ষণতার সাথে প্রতিষেধক প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। খেয়াল রাখা উচিৎ কোন প্রকারেই যেন উত্তেজনা বৃদ্ধি না পায় বরং পরিস্থিতি প্রশমিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তৎপরতা যথাযথভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট ও উপযোগী উপকরণ হল কোরআন ও সুন্নাহর শানিত জ্ঞান।

জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও অধিক গুরুত্বের আধার এবং মর্যাদাপূর্ণ। অন্য কথায় মসী অসির চেয়েও অধিক শক্তিশালী। তাই উত্তেজনা সৃষ্টি করে ফোবিয়ার শিকার হয়ে শাহাদত বরণের তুলনায় মসীর যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে জব্দ করা অনেক গুণে অধিক মর্যাদার বিষয়।

দৃঢ়তা অবলম্বন ও ধৈর্যের সাথে যুক্তি সহকারে প্রতিপক্ষের অভিযোগ খ ন, তাদের বিভি-ন্ন ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন, ইসলামের ভ্রান্ত উপস্থাপনা ও অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁতভাঙ্গা জবাব সম্ভাব্য মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে ছড়াতে হবে যেন তা বিভ্রান্তির স্রোতকে বিপরীত দিকে মোড় ঘুরাতে সক্ষম হয়।

এটা সত্য যে সকল কাঠিন্য ও প্রকিতকূলতা উৎরানোর সাথে সাথেই আসে আনুকূল্য ও সাফল্য। বিরুদ্ধবাদীদের এহেন অপপ্রচার সামাল দিলেই প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রচার ও সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পায়। রাসূলের (সা) কাজের প্রচার এমনিভাবেই বিরোধীদের শিবিরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যশীলদের পদচুম্বন করে বিজয় এনে দেয়।

সাফল্য অর্জন এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিজয় অর্জনের অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত উম্মাহর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। ভাষা, ভৌগোলিক ও যাবতীয় বর্ণবৈষম্য ভুলে কুরআনের আহ্বান– 'তায়ালাও ইলা কালিমাতিন সায়াউম বায়নানা ও বায়নাকুম আল্লা তা'বুদু ইল্লাল্লাহ'– এই কালেমার ভিত্তিতে গোটা মুসলিম জাহানের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। ওআইসি সহ সকল আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহকে কার্যকর করে তুলতে হবে।

'কারবালার বিপর্যয় প্রতিবারেই ইসলামী পুনর্জাগরণ আনে' এই প্রবাদ আশা করা যায় এবারের বিপর্যয়েও মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। পৃথিবীর জিও-ফিজিক্যাল

www.bjilibrary.com

গুরুত্বপূর্ণ রিজিয়নে যে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান তার সুবিধা কাজে লাগিয়ে বিশ্ব সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে মুসলিম জাহানের নেতৃবৃন্দকে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আজকের মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পেছনে পড়ে থাকার কারণে এর সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি অন্য শক্তির সহায়তা নির্ভর হয়ে রয়েছে। মুসলিম জাহানে ইসলামী মূল্যবোধ জাগৃতির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দারুণ অভাব রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার দিয়ে শত্রুদের মিথ্যা প্রচারণার গতি পাল্টানোর জন্য ইলেক্ট্রনিক সুপার হাইওয়ের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। প্রিন্ট মিডিয়াকেও একই উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে হবে।

তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণের মাঝে ঐক্য ও সংহতি আনয়ন কোন কঠিন কাজ হতনা যদি আলেম, মাশায়েখ, মুফতি, ফকিহ ও পীর সাহেবানদের মাঝে মৌলিক বিষয়ে কোন বিরোধ না হত। এই বিরোধকে দূরীকরণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইন্টেলেকচ্যুয়েলদের বিশেষভাবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে যুগের মুজতাহিদ এবং মুজাদ্দিদ হিসেবে আন্তর্জাতিক ময়দানে সার্বিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।

পরমত সহিষ্ণুতা এবং অন্যদের যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর সেসবের কল্যাণের স্বীকৃতি দান ও তা গ্রহণে সহনীয়তা প্রদর্শন ইসলাম ফোবিয়া মুকাবিলা করার জন্য বড় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। যা কিছু হারাম ইসলামী শরীয়া তা স্পষ্ট করেই বর্ণনা করেছে। যা হারাম নয় তা হারাম করার এখতিয়ার কাউকে দেয়া হয়নি। সেই প্রেক্ষিতে ইসলাম যতদূর পর্যন্ত টলারেন্সের সীমানা দেয় তাকে কোন প্রকারেই সংকুচিত করা আজকের এই আধুনিক বিশ্বে সমীচীন হবে না।

আল কুরআন, তাফসীর গ্রন্থ কিংবা এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ কারো ঘরে থাকলে তা এত উচ্চ তাকে রাখা হয় যা ধূলি ধুসরিত হলেও অনেক সময় স্পর্শ করা হয়না। কারো মৃত্যুর পর, নতুন বাড়ী ঘর কিংবা ব্যবসা কেন্দ্র উদ্বোধনে এসব কিতাব মাওলানা কিংবা তালেবে-ইলমদের দ্বারা পড়িয়ে দোয়া করানোর জন্য কাজে লাগানো হয়। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, সাইয়েদ কুতুব প্রমুখের অহেতুক সমালোচনায় শরীক হতে অনেকেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের উৎসের সাথে যাচাই করে যথার্থ সমালোচনা করার যোগ্যতা অর্জনের কেউই প্রয়োজন মনে করে না। বস্তুত জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান পেতে মুসলিমদের কুরআন ও সুন্নাহ চর্চা করতে হবে।

মাতৃভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং ইসলামী সাহিত্যের মাঝে আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ রিসোর্স বৃদ্ধি করতে হবে।

বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র স্বীকৃতি দিয়ে তার ভাল দিকসমূহ এডপ্ট করতে

www.bjilibrary.com

হবে। তাওহীদ প্যারাডাইম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে (যা মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়) মতপার্থক্য মেনে নিতে হবে।

ইসলামী এপিস্টেমোলোজির ভিত্তিতে উম্মাহর জন্য মৌলিক শিক্ষার একটি সাধারণ কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় কোর কোর্স সমূহের জন্য একটি মডেল কারিকুলাম তৈরী করতে হবে যেন তা উম্মাহ গ্রহণ করে।

বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উপযোগী আন্তর্জাতিক রীতিনীতি প্রণয়ন, সংস্কার সাধন কিংবা প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক মুসলিম স্কলারবৃন্দেও সমন্বয়ে গবেষণা সেল গঠন করতে হবে।

ষড়যন্ত্রকারীদের পাতানো ফাঁদে আটকানো বিপথগামী রাজনৈতিক কর্মীদের, চরমপন্থীদের ব্যাপারে পরিস্থিতি ও পরিবেশ উপযোগী উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইসলামের দাওয়াতী তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধ ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ও বিশেষ করে ই-মেইলের ব্যাপক হারে ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

মাদ্রাসার ট্রেডিশনাল শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার সাধন করতে হবে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কোয়ালিটি শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের মরালিটি গঠনে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

লীডারশিপ প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম থেকে হাই কোয়ালিটি দেশপ্রেমিক নেতা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

পশ্চিমাদের খুশি করার জন্য নয় বরং নিজেদের মাঝে সহিষ্ণুতা, দয়ার্দ্রতা, মহানুভবতা ও এহেন যাবতীয় ইসলামী সৌন্দর্য ও সুরভী বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষেপণাস্ত্রের জোর বাড়াতে হবে।

মহান আল্লাহর বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ উম্মাতের মর্যাদায় থাকার উদ্যোগ নিয়ে মধ্যযুগীয় বিশাল সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে মুসলিমরা যতটা অগ্রগামী হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর গোলামী যুগে হীনমন্যতার শিকার হয়ে তারা ততোধিক পিছিয়ে পড়েছে। হারানো শ্রেষ্ঠত্ব তাদের পুনরুদ্ধার করতেই হবে।■

লেখক-পরিচিতি : ড. এম. উমার আলী– বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং ভাইস চ্যান্সেলর– মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৩১শে মে, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.bjilibrary.com

হান্টিংটন ডকট্রিন ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

■

ঠাণ্ডা লড়াই-উত্তর বিশ্বে মানুষের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয়ই হবে সংঘাতের প্রাথমিক উৎস এটাই হচ্ছে হান্টিংটনের বিতর্কিত মতবাদের মূল কথা। ১৯৯২ সালে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা লিখিত The End of History and the last man শীর্ষক পুস্তকের জবাবে ১৯৯৩ সালে মিঃ স্যামুয়েল পি হান্টিংটন Foreign Affairs সাময়িকীতে The Clash of Civilization শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর মতবাদের একটি রূপরেখা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালে তিনি The Clash of Civilization and the Remaking of World Order শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা করেছেন।

ঠাণ্ডা লড়াই-উত্তর পরিবেশে বিশ্ব রাজনীতির প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী থিওরীসমূহ ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হান্টিংটন তাঁর ভাবতত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করেন। কিছু কিছু তাত্ত্বিক ও লেখকের মতে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের সকল জাতির সামনে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে উদার গণতন্ত্র এবং পাশ্চাত্য মূল্যবোধের অনুসরণ করা। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার যুক্তি হচ্ছে হেগেলীয় মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব এখন তার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে এসে পৌছেছে। এই অধ্যায়ে তার অবস্থা কি হবে হান্টিংটন তাঁর মতবাদে সে সম্পর্কে একটি রূপরেখা দিয়েছেন।

হান্টিংটনের বিশ্বাস অনুযায়ী আইডিওলজী বা অধিবিদ্যার যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন বিশ্বব্যবস্থা এমন এক অবস্থায় ফিরে গেছে সাংস্কৃতিক সংঘাত যার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর গবেষণা নিবন্ধে জোর দিয়ে বলেছেন যে, সংস্কৃতি এবং ধর্মই হবে ভবিষ্যত সংঘর্ষের

www.bjilibrary.com

প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু। তিনি এই ধারণাকে আরো সম্প্রসারণ করে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে সাংস্কৃতিক পরিচয় হচ্ছে বিভিন্ন সভ্যতার সর্বোচ্চ পদবী এবং এই পরিচয়ই সাংঘর্ষিক সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণে সহায়তা করবে। তাঁর ভাষায়, "It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great division among human kind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The Clash of Civilization will dominate global politics. The fault lines between civilization will be the battle lines of the future."

তাঁর পুস্তকের মূল প্রসঙ্গ অনুযায়ী সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় বৃহত্তর পর্যায় ও পরিসরে সভ্যতার সাথে মিশে যায় এবং এই অবস্থায় তা ঠাণ্ডা লড়াই-উত্তর বিশ্বে সংযোগ-সংশক্তি, বিভেদ-বিচ্ছেদ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দৃষ্টান্ত তৈরি করে। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এই পুস্তকে মিঃ হান্টিংটন এই অনুমানেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রথম খণ্ডের সার কথা হচ্ছে, ইতিহাসে এই প্রথমবার বিশ্ব রাজনীতি একই সাথে multi polar এবং multicivilizational রূপ নিয়েছে; আধুনিকায়ন পাশ্চাত্যায়ন থেকে স্বতন্ত্র এবং তা যেমন পারছে না অর্থবহ সার্বজনীন কোনও সভ্যতা সৃষ্টি করতে, তেমনি পারছে না পাশ্চাত্যের বাইরের সমাজগুলোকে পাশ্চাত্য ধাঁচে তৈরি করতেও।

দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি বলেছেন, সভ্যতাগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য স্থানান্তরিত হচ্ছে, পাশ্চাত্যের প্রভাব তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এশীয় সভ্যতাগুলো তাদের অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। মুসলিম জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটছে। ফলে মুসলিম দেশসমূহ ও তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে, পাশ্চাত্য বহির্ভূত সভ্যতাগুলো তাদের সংস্কৃতির মূল্যবোধসমূহকে পুনর্মূল্যায়ন ও পুনরুজ্জীবনে বাধ্য হচ্ছে।

পুস্তকের তৃতীয় অংশে মিঃ হান্টিংটন বলতে চেষ্টা করেছেন যে, বর্তমান দুনিয়ায় সভ্যতাভিত্তিক একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠছে যেখানে সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কুটুম্বিতা বা সাদৃশ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করছে, সমাজকে এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতায় স্থানান্তরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে এবং সভ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ সংগঠিত হয়ে জোট গঠন করছে। এই জোট গঠনে মধ্যমণির কাজ করছে সভ্যতার নেতৃত্বদানকারী শক্তিধর দেশসমূহ।

www.bjilibrary.com

গ্রন্থকার তাঁর পুস্তকের চতুর্থ অংশে বলেছেন যে, পাশ্চাত্যের সার্বজনীনতার ভান (universalist pretentions) তাকে বর্ধিত হারে অন্যান্য সভ্যতার সাথে সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ইসলাম এবং চীনের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। স্থানীয় পর্যায়ে মুসলমান-অমুসলমান যুদ্ধ মিত্র দেশসমূহের মধ্যে ঐক্যের (Kin-country rallying) সৃষ্টি করছে যা বৃহত্তর পরিসরে যুদ্ধকে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যুদ্ধকে ঠেকানোর জন্য শক্তিধর নেতৃস্থানীয় দেশগুলো উদ্যোগী হয়ে উঠছে।

পঞ্চম অংশে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে, প্রত্যেকের বেঁচে থাকা নির্ভর করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তাদের পশ্চিমী পরিচয়কে নিশ্চিত ও পুনরুজ্জীবিত করা এবং পশ্চিমী দেশগুলো কর্তৃক তাদের সভ্যতাকে সার্বজনীন নয় বরং অনন্য হিসেবে গ্রহণ এবং সংরক্ষণ করা এবং পশ্চিমা সমাজের বাইরের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার ওপর। তাঁর মতে সভ্যতাসমূহের বৈশ্বিক সংঘর্ষ বর্জন নির্ভর করবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিশ্ব-রাজনীতির বহুমুখী সভ্যতার চরিত্রকে মেনে নেয়া এবং সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করার ওপর।

মিঃ হান্টিংটনের মতে, মানবেতিহাসের অধিকাংশ সময় আন্তঃসভ্যতা যোগাযোগ হয় বাধাগ্রস্ত হয়েছে, না হয় মোটেই ছিল না। ১৫০০ খৃস্টাব্দের দিকে আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নে বিশ্ব রাজনীতিতে দ্বিমুখী প্রবাহের সৃষ্টি হয়। প্রায় চারশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে পাশ্চাত্যের জাতি রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, জার্মানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্যরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যন্তরে একটি multi polar আন্তর্জাতিক পদ্ধতি সৃষ্টি করে পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ ও রাষ্ট্র সীমানা সম্প্রসারণ ও উপনিবেশ সৃষ্টি এবং অন্যান্য উপায়ে অপরাপর সভ্যতাকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করে। ঠাণ্ডা লড়াই এর সময় বিশ্ব রাজনীতি দ্বিমুখী হয়ে পড়ে এবং সমগ্র বিশ্ব তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। ধনী এবং গণতান্ত্রিক দেশসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কম্যুনিস্ট দেশসমূহের বিরুদ্ধে আদর্শিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কোন কোন সময় সামরিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের অধিকাংশই এই দুই শিবিরের বাইরে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে সংঘটিত হয়; এই দেশগুলো শুধু দরিদ্র ছিল না, রাজনৈতিক দিক থেকেও ছিল অস্থিতিশীল, সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এবং জোট নিরপেক্ষ।

আশির দশকের শেষ ভাগে কম্যুনিস্ট বিশ্ব ভেঙ্গে পড়ে এবং ঠাণ্ডা লড়াই ভিত্তিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পদ্ধতি ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। হান্টিংটনের মতে, এরপর বিশ্বে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মানুষের মধ্যে ব্যবধানের গুরুত্বপূর্ণ কারণ

www.bjilibrary.com

আদর্শ, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট নয়; এই কারণ সাংস্কৃতিক। এখন বিভিন্ন দেশ ও জাতি যে মৌলিক মানবিক প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছে তা হচ্ছে, আমরা কে? অনন্তকাল ধরে যে চিরাচরিত পদ্ধতিতে মানুষ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে তারাও সে পদ্ধতিরই অনসুরণ করছে অর্থাৎ তারা নিজেদের পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা, ইতিহাস মূল্যবোধ এবং রীতি প্রথাগুলোর আলোকে নিজেদের পরিচয় নির্ণয়ের চেষ্টা করছে। তারা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও জাতি সত্তা, ধর্মীয় সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী এবং বৃহত্তর অংগনে সভ্যতার সাথে একাত্ম হবারও চেষ্টা করছে। রাজনীতিকে মানুষ তাদের স্বার্থ হাসিল শুধু নয় পরিচয় নির্ণয়ের বাহন হিসেবেও ব্যবহার করছে। হান্টিংটনের ভাষায়, "We know who we are only when we know who we are not and often only when we know whom we are against." অর্থাৎ আমরা কে নই এবং কার প্রতিপক্ষ যখনি আমরা এটা জানি তখনি শুধু আমরা বুঝতে পারি যে আমরা কে? তিনি আরো বলেছেন যে, বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় জাতি রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে মূল নায়ক, ক্ষমতা এবং বিত্তের পশ্চাদ্ধাবন অতীতে তাদের আচরণের প্রকৃতি নির্ণয় করেছে, পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকার ও মিল-গরমিলও তাদের চারিত্রিক কাঠামো ঠিক করেছে। এই প্রেক্ষিতে বিশ্ব এখন তিনটি ব্লকে বিভক্ত নয় বরং সাত-আটটি বৃহৎ সভ্যতার মধ্যে বিভক্ত। পাশ্চাত্যের বাইরের সমাজ বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্ধিত সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাবের ভিত্তি তৈরি করছে। তাদের শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস যত বাড়ছে Non-western সমাজ ও দেশগুলো ততই তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতিকে দৃঢ়তর করছে। তারা পাশ্চাত্য সমাজ কর্তৃক তাদের ওপর যে মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাকেও পরিত্যাগ করছে। হেনরী কিসিঞ্জারের ভাষায়, "The international system of the 21st century will contain at least six major powers The United States, Europe, China, Japan, Russia and probably India- as well as multiplicity of mediumsized and smaller countries." কিসিঞ্জারের ছয়টি বৃহৎ শক্তির পাঁচটিই বিভিন্ন সভ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট; এ ছাড়াও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী দেশসমূহ যাদের কৌশলগত অবস্থান, বিশাল জনসংখ্যা অথবা তৈল সম্পদ বিশ্বব্যবস্থায় তাদের প্রভাবশালী করে তুলেছে। এই নতুন পৃথিবীতে স্থানীয় রাজনীতি হচ্ছে Ethnicity'র আর বিশ্ব রাজনীতি হচ্ছে সভ্যতার রাজনীতি। এখানে পরাশক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান দখল করেছে সভ্যতার দ্বন্দ্ব।

সভ্যতার বিভাজন ও আতংকের কারণ ঃ

হান্টিংটন তাঁর গবেষণা নিবন্ধে বিশ্বের প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করেছেন :

www.bjilibrary.com

১. পাশ্চাত্য সভ্যতা : পশ্চিম ইউরোপ, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উত্তর আমেরিকা হচ্ছে এর কেন্দ্রবিন্দু; প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব তিমুর, নিউজিল্যান্ড, সুরিনাম, ফরাসী গিনি, উত্তর মধ্য ফিলিপাইন এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। হান্টিংটনের মতে ল্যাটিন আমেরিকা ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হবে, না স্বতন্ত্র সভ্যতা নিয়ে টিকে থাকবে– এই বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য একটি বিরাট বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

২. গোঁড়া বা ধর্মান্ধ জগত (Orthodox World) : বেলারুস, বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, জর্জিয়া, গ্রীস, মেসিডোনিয়া, মোলডাভিয়া, মন্টিনেগ্রো, রুমানিয়া, রাশিয়া, সার্বিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি এই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত, তবে এদের কখনো কখনো পাশ্চাত্য সভ্যতার অংশও বলা হয়ে থাকে।

৩. ল্যাটিন আমেরিকা : এটাকে স্থানীয় আদিবাসী এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের শংকর বা হাইব্রীড বলা হয়ে থাকে। সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও একে পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছুটা অংশ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এই অঞ্চলটির দক্ষিণাংশের অধিকাংশ লোকই নিজেদের পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিপূর্ণ অংশ বলে মনে করে।

৪. মুসলিম বিশ্ব : মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আজারবাইজান, বাংলাদেশ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, সোমালিয়া, মিন্দানাও এবং ভারতের অংশবিশেষ এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত।

৫. হিন্দু সভ্যতা : ভারত এবং নেপাল এর আবাসস্থল। বিশ্বের অনাবাসী ভারতীয় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা এই সভ্যতার অংশ।

৬. চৈনিক সভ্যতা : চীন, কোরিয়া, সিংগাপুর, তাইওয়ান ও ভিয়েতনাম এর অংশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীনা ও মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীও এর অন্তর্ভুক্ত।

৭. জাপান : চীনা সভ্যতা ও প্রাচীন আলপাইন পদ্ধতির হাইব্রীড।

৮. সাব-সাহারান আফ্রিকা।

৯. ভূটান, ক্যামবোডিয়া, লাওস, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, অরুনাচল প্রদেশ, নেপালের অংশ বিশেষ, সাইবেরিয়ার অংশ বিশেষ এবং তিব্বতের প্রবাসী সরকারকে অন্যান্য সভ্যতা থেকে আলাদা সভ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। হান্টিংটনের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে এই এলাকা বৃহৎ কোনও সভ্যতার অংশ নয়।

www.bjilibrary.com

১০. প্রধান সভ্যতাগুলোর যে কোন একটির অংশ হবার পরিবর্তে ইথিওপিয়া, হাইতি এবং তুরস্ককে নির্জন দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। হান্টিংটনের মতে একটি অনন্য রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলের নিজস্ব সভ্যতা আছে, তবে তা পশ্চিমা সভ্যতার মতই। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী সাবেক বৃটিশ উপনিবেশ ক্যারিবিয়ানের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে।

১১. কোন কোন ক্ষেত্রে চৈনিক, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জাপানী সভ্যতা একীভূত হয়ে "ইস্টার্ণ ওয়ার্ল্ড" নামে একটি নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে।

হান্টিংটনের যুক্তি অনুযায়ী ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হবার পর বৈশ্বিক সংঘর্ষের প্রবণতাসমূহ বর্ধিত হারে বিভক্ত সভ্যতাসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, চেচনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং যুগোশ্লাভিয়া ভেঙ্গে যাবার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত যুদ্ধ বিগ্রহসমূহকে আন্তঃসভ্যতা সংঘর্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধকে তিনি দেখেছেন এরই একট বৃহত্তর পরিসর হিসাবে। তিনি একটি রেখচিত্রের মাধ্যমে আটটি প্রধান সভ্যতার সাংঘর্ষিক সম্পর্ক চিহ্নিত করেছেন। এই রেখচিত্র অনুযায়ী ইসলামী সভ্যতাই হচ্ছে একমাত্র সভ্যতা যার সাথে একই সাথে চারটি সভ্যতার সরাসরি সাংঘর্ষিক সম্পর্ক রয়েছে বা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। এই সভ্যতাগুলো হচ্ছে অর্থোডক্স বা রুশ সভ্যতা, আফ্রিকান সভ্যতা, পশ্চিমা সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতা। তাঁর থিউরী অনুযায়ী একমাত্র চৈনিক সভ্যতার সাথেই ইসলামী সভ্যতার সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত কম সাংঘর্ষিক বা সহনশীল, জাপানী সভ্যতা অথবা ল্যাটিন আমেরিকান সভ্যতার সাথে তার সরাসরি যোগাযোগ নেই।

সম্প্রসারণশীল ইসলামী বিশ্বের সম্ভাব্য প্রভাব প্রতিপত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সভ্যতার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ড ও জনসংখ্যার তথ্য চিত্রও তুলে ধরেছেন। তাঁর দেয়া তথ্যানুযায়ী, ১৪৯০ সালে পাশ্চাত্য সমাজ বলকান এলাকা ছাড়া ইউরোপীয় উপদ্বীপের বেশিরভাগ এলাকা তথা প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ মাইল নিয়ন্ত্রণ করতো। ঐ সময় এন্টার্কটিকা ছাড়া সারা বিশ্বের আয়তন ছিল ৫ কোটি ২৫ লক্ষ বর্গমাইল। ১৯২০ সালে সরাসরি তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ বর্গমাইল যা বিশ্ব ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেক। আবার ১৯৯৩ সালের দিকে এই ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক কমে ১ কোটি ২৭ লক্ষ বর্গমাইলে নেমে আসে, তাও আবার উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডসহ। পক্ষান্তরে ইসলামী দেশসমূহের ভূখণ্ডগত এলাকা ১৯২০ সালের ১৮ লক্ষ বর্গমাইল থেকে ১৯৯৩ সালে ১ কোটি ১০ লক্ষ বর্গ মাইলে উন্নীত হয়। জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। ১৯০০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ ছিল পাশ্চাত্যবাসী এবং পাশ্চাত্যের সরকারগুলো এই জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশকে শাসন করেছে। ১৯২০ সালে এদের সংখ্যা ৪৮ শতাংশে উন্নীত হয়। আবার নব্বই-এর

www.bjilibrary.com

দশকের প্রথম দিকে পশ্চিমা সরকারগুলোর নিয়ন্ত্রণ পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে যাদের সংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় মাত্র ১৩ শতাংশ। ২০২৫ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ১০ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে একই সময়ে ইসলামী দেশসমূহের জনসংখ্যা ৪.১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ শতাংশে উপনীত হয়েছে যা ২০২৫ সাল নাগাদ ১৯.২ শতাংশে উপনীত হবে।

অন্যদিকে সামরিক সম্ভাবনা ও সামরিক জনশক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যের তুলনায় ইসলামী সভ্যতার অবস্থান দৃঢ়তর হচ্ছে বলেও হান্টিংটনের ধারণা। তাঁর দেয়া তথ্যানুযায়ী ১৯০০ সালে বিশ্বের মোট সৈন্য সংখ্যার ৪৩.৭ ভাগ ছিল পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণে, ১৬.৭ ভাগ ইসলামী বিশ্বের। ১৯৯১ সালে এসে এই সংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এই বছর নাগাদ পাশ্চাত্যের ভাগে আসে ২১.১ শতাংশ ইসলামী বিশ্বের ২০.০০ শতাংশ, চীনের ২৫.৭ শতাংশ এবং হিন্দু সভ্যতার অধীনে মাত্র ৪.৮ শতাংশ।

পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও তিনি উল্লেখ করেছেন। সেটা হচ্ছে পশ্চিমা দেশসমূহে জনসংখ্যার ভারসাম্য হ্রাস এবং জনশক্তি চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ আমদানী ও তাদের নাগরিকত্ব প্রদান। এর ফলে এই দেশসমূহের একদিকে সাংস্কৃতিক সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে সমাজের অপাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তো হচ্ছেই। অবস্থা এখন এমন নাটকীয় মোড় নিচ্ছে যে পাশ্চাত্যবাসীরা নিজ দেশেই সংখ্যালঘু হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অধর্ম, ব্যভিচার ও চরিত্রহীনতার কারণে সভ্যতার বুনিয়াদ পরিবার ভেঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ার কারণে তাদের মূল্যবোধেও আঘাত আসছে ব্যাপকভাবে এবং এ আঘাতের একটা অংশ muslim expatriate-দের তরফ থেকে আসছে বলে তাদের ধারণা। এর মধ্যে কয়েক বছর আগে আরেকটি নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। বার্নার্ড লুইস নামক হোয়াইট হাউসের একজন আরবী বিষয়ক পণ্ডিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইউরোপ মুসলিম হয়ে যাবে, becoming part of the Arab west, the magrib. Londonistan এর ভয়তো দীর্ঘ দিনের। এ দিকে নাইন-ইলেভেন উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধাররা প্রমাদ গণতে শুরু করেছেন। লেখক বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে এলেন। Bruce Brawer-এর "While Europe slept : How Radical Islam is Destroying the west from within". Claire Berlinski'র "Menace in Europe : Why the Continent's crisis is America's Too." Milton Viorst এর "Storm from the East : The Struggle Between the Arab World and the Christian W এবং Jytte Klausen লিখিত "The Islamic Challenge : Politcs and Religion in Western Europe" প্রভৃতি

www.bjilibrary.com

বইগুলো হান্টিংটনের Clash Theory-কে উস্কানী দেয়ার জন্যই তাঁরা লিখেছেন। তবে হান্টিংটনের থিওরীর ভিত্তি যেমন দুর্বল এই লেখকদের ব্যবহৃত তথ্য উপাত্ত এবং ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানও তেমন দুর্বল। তাঁদের এই উদ্যোগ যে যুক্তরাষ্ট্রের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার অংশ এটা ইতোমধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে The Economist পত্রিকা তার গত ২৪ জুনের সংখ্যায় লিখেছে :

Four authors of recent books about America's conflict with Islamism are like blind men feeling an elephant- each one describes the problem in a slightly different way. What unites them though is a single over-arching question : If the jihadists are just a bunch of blood thirsty, head chopping, woman haters why does the west have such a hard time gaining the moral high ground in what America persists in calling the War on Terror?

মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এতদিন ধরে যে অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল খোদ তারাই এখন তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ইউরোপ তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংকটে এখন জর্জরিত। খৃস্টান আমেরিকা ও ইউরোপের নাস্তিক হতে আপত্তি নেই কিন্তু ইসলামের গন্ধ তারা সহ্য করতে পারেন না। তাদের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের অনেকে এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

হান্টিংটনের মতবাদ সম্বলিত পুস্তকটি আগা গোড়া পড়লে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাঁর দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের দেশগুলো তাদের মূল্যবোধকে সার্বজনিন বলে মনে করে এবং তাদের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে কপটতা নেই। তথাপিও এই মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্রকে যদি তারা অপরাপর সভ্যতার উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে তাহলে তাদের শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তবে পশ্চিমারা এ সত্যটি স্বীকার করতে চায় না। কেননা বিশ্বের চলমান আন্তর্জাতিক পদ্ধতি তাদেরই সৃষ্টি, এর আইন তারা বানিয়েছেন এবং জাতিসংঘের আকারে তাকে একটি কাঠামো ও পরিচয় দিয়েছেন। মিঃ হান্টিংটন পাশ্চাত্য বিশ্বের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থানান্তরের প্রস্তুতি দেখতে পেয়েছেন। এই ক্ষমতা যাদের হাতে যাচ্ছে তারা হচ্ছে তাঁর ভাষায় 'Challenger Civilization'. তাদের পরিচয় চৈনিক সভ্যতা ও ইসলাম।

তিনি বলতে চেয়েছেন পূর্ব এশিয়ায় সনাতন মূল্যবোধ নিয়ে চীন জেগে উঠেছে, তার সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক নেতৃত্ব ও মাতব্বরির আসন দখল করা। কনফুসিয়ান ধর্ম বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে দুই কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম তাকে সমর্থন যোগাবে।

www.bjilibrary.com

এর ফলে পাশ্চাত্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী ও দীর্ঘমেয়াদী হুমকির সৃষ্টি হবে।

হান্টিংটনের আরো ধারণা, ইসলামী সভ্যতার অভ্যন্তরে জনসংখ্যার ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটছে এবং এর ফলে তার সীমান্ত ও অভ্যন্তর অশান্ত হয়ে উঠছে। মৌলবাদী আন্দোলন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ১৯৭৯ সালের ইরানী বিপ্লব, সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধে ইসলামী দেশগুলো কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা প্রভৃতি হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিতে Islamic Resurgence এর বাস্তব অভিব্যক্তি।

চীনকে হান্টিংটন ইসলামী দেশসমূহের সম্ভাব্য মিত্র বলে মনে করেন। উভয়ের স্বার্থ এবং পছন্দ অপছন্দের মধ্যে তিনি মিল দেখতে পেয়েছেন। Weapons Proliferation, Human Rights, Democracy প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয় সভ্যতা পাশ্চাত্য থেকে ভিন্ন ধরনের মত পোষণ করে। প্রয়োজনে এরা উভয়ে এক হয়ে যেতে পারে। তাঁর ভাষায় রাশিয়া, জাপান ও ভারত হচ্ছে Swing Civilization. তারা সুবিধা অনুযায়ী মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য কিংবা চীন মুসলিম জোট উভয়কেই সমর্থন করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়া তার দক্ষিণ সীমান্তে (যেমন চেচনিয়া) ইসলামী গ্রুপসমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। আবার তেলের প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা ও রাশিয়ার অভ্যন্তরে সংঘাত এড়ানোর জন্য ইরানকে সহযোগিতা দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক অংগনে চীনা প্রভাব বৃদ্ধির জন্য একটি Sino-Islamic Connection এর অভ্যুদয় ঘটছে বলেও তাঁর ধারণা যার আওতায় ইরান, পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে চীন আরো নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করবে। এ প্রবণতাকে ঠেকাতে হবে।

হান্টিংটন বলেছেন যে সভ্যতার লড়াই নতুন নয়; এটা বিশেষভাবে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। এ প্রেক্ষিতে তিনি ইসলামী ও ইসলামী সভ্যতার সীমানাকে Bloody Borders হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলামের বিরুদ্ধে বর্তমানে পাশ্চাত্যের যে War on Terror চলছে এটা নতুন কিছু নয়, দিকভ্রান্ত বিপ্লবী কিছু যুবকের অদূরদর্শী তৎপরতার পরিণামও নয়, বরং দুই সভ্যতার হাজার বছরের বেশি পুরাতন দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতা। ইউরোপে ইসলামের পদার্পন, স্পেন থেকে তাদের বহিষ্কার, উসমানীয় শাসকদের পূর্ব ইউরোপ ও ভিয়েনা আক্রমণ এবং আঠারো ও উনিশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক মুসলিম দেশগুলোর বিভক্তির মধ্যে এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস লুক্কায়িত রয়েছে। মূলতঃ পাশ্চাত্যের সাথে মুসলিম বিশ্বের সংঘর্ষ, খৃস্টানদের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্বেরই নামান্তর। উভয় ধর্মই একে অপরকে ধর্মান্তরে বিশ্বাস করে। উভয় ধর্মের বিশ্বাসীরাই মনে করে যে শুধু তাদের ধর্মই সত্য, অন্যেরটা নয়।

হান্টিংটনের বিশ্বাস অনুযায়ী এই দ্বন্দ্বের সাম্প্রতিক কারণ হচ্ছে– Islamic Resurgence and demographic explosion in Islam coupled with the

www.bjilibrary.com

values of western universalism- that is the view that all civilizations should adopt western values that infuriate Islamic fundamentalists. বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ এবং মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে পাশ্চাত্য তাদের ডেথ ওয়ারেন্ট দেখতে পাচ্ছে। তাদের মূল্যবোধের প্রত্যাখ্যানকে তারা সহ্য করতে পারছেনা। এই ঐতিহাসিক এবং সাম্প্রতিক কারণগুলোর তাৎপর্যই তিনি প্রথমে তাঁর নিবন্ধে ও পরে তাঁর পুস্তকে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে এর ফলে পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতা রক্তাক্ত সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী চীনের সাথে পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের পাশাপাশি একবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামী সভ্যতার সংঘাত হবে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী। নাইন-ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলা এবং তৎপরবর্তী আফগান ও ইরাক যুদ্ধ তারই সাক্ষ্য বহন করে।

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

স্যামুয়েল হান্টিংটন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, জন এম আলন ইনস্টিটিউট ফর স্ট্যাটিজিক স্টাডিজ এর পরিচালক এবং হার্ভার্ড একাডেমী ফর ইন্টারন্যাশনাল এন্ড এরিয়া স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান। তিনি কার্টার প্রশাসনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিকিউরিটি প্ল্যানিং এর পরিচালক এবং ফরেন পলিসি জার্নাল এর কো এডিটার এবং আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তাঁর মতো বড় মাপের একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞের লিখনী থেকে সভ্যতা সংঘাতের এই ডকট্রিন বেরিয়ে আসার পর বিশ্বব্যাপী নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেউ কেউ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে, ইতিহাসের অমোঘ পরিণতির কথাই তিনি দুনিয়াবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কারুর কারুর মতে ইসলামী সভ্যতার এক শ্রেণীর অনুসারী মৌলবাদের প্রসার এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানব জাতিকে শৃঙ্খলিত করার যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সভ্যতা তার মুকাবিলায় সাম্প্রতিক বছরসমূহে যে সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে হান্টিংটনের এই মতবাদ বিপুলভাবে উৎসাহিত করবে এবং তিনি ইতিহাসের যথার্থ বিশ্লেষণ করেই Clash of Civlization theory উদ্ভাবন করছেন। তবে তাঁর সমালোচকরাও কম যাননি, তাঁরা তাঁর চিহ্নিত সভ্যতাগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলেছেন তাঁর দেখা সভ্যতার সংঘাত বস্তুতঃ বায়বীয়। কম্যুনিজমের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তার কোনও পতিদ্বন্দ্বী এখন নেই। কম্যুনিজমকে পরাভূত করার জন্য তারা মুসলিম বিশ্বকে কাজে লাগিয়েছে। বিশ্বব্যাপী তাদের আধিপত্য বজায় রাখার পথে তারা এখন মুসলিম বিশ্ব এবং চীনকে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এ অবস্থায় প্রাথমিকভাবে সংঘাতের নামে ইসলামী শক্তিকে তারা আঘাত করতে চায়। চীন হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় টার্গেট। হান্টিংটন এই পরিকল্পনার দার্শনিক পটভূমি দাঁড় করিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেছেন যে, হান্টিংটনের বই পড়ে মনে হয় যে সংঘাত-সংঘর্ষ ছাড়া সভ্যতার আর কোনও কাজ নেই। তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হবে, মারামারি করবে এবং এভাবে প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়ায় দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা প্রকৃত পক্ষে সভ্য সমাজের কাজ নয় বরং বর্বর সমাজের কাজ। হান্টিংটন এই বর্বরতাকেই সভ্যতা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চিহ্নিত সভ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। খৃস্ট ধর্মের প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে নিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা। এই দুই সম্প্রদায়ের অবস্থান এবং পশ্চিম ইউরোপের জার্মান ও রোমান সংস্কৃতির ব্যবধানও তার থিওরীতে আসেনি। একই ভাবে চীনের মিত্র হিসেবে ভিয়েতনামকে প্রদর্শন করা হলেও চীনা সভ্যতার হাইব্রীড হিসেবে তাকে স্বতন্ত্র সভ্যতার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অথচ চীনকে পাহারা দেয়ার জন্য ভিয়েতনাম বিশাল বহরের একটি সেনাবাহিনী পোষণ করছে। তাঁর হিসাবে তিনি বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত মুসলিম সমাজের বাস্তবতাকেও স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে হান্টিংটনকে আমি আদিম বৃত্তিতে বিশ্বাসী একজন পন্ডিত (Primordialist) বলে মনে করি। আদিম যুগে বিভিন্ন গোত্র, উপজাতি এবং পাড়ায় পাড়ায় কলহ বিবাদ হতো। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের এই যুগে তিনি ঐ কলহকে সভ্যতার কলহে পরিণত করে মানব জাতিকে অসভ্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছে।

পল বার্মান তার Terror and Liberalism শীর্ষক পুস্তকে সভ্যতার সংঘাত সংক্রান্ত অনুমানের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, বর্তমানে সাংস্কৃতিক সীমানা বলে সুনির্দিষ্ট কোনও বস্তু নেই। পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তিও অত্যন্ত দুর্বল। এ প্রেক্ষিতে সভ্যতার সংঘাতের অনুকূলে প্রদর্শিত যুক্তি জোরালো নয়। তার জিজ্ঞাসা যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের সম্পর্ক অথবা ইউরোপ-আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা অধ্যুসিত অঞ্চলে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের বিষয়টি এক্ষেত্রে কিভাবে বিশ্লেষণ করা হবে? তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে যাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা হান্টিংটন ইসলামী চরমপন্থী বলে থাকেন তারা উচ্চশিক্ষা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা জীবিকার তাকিদে তাদের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পাশ্চাত্য দেশে কাটিয়েছেন। বার্মানের মতে স্বার্থ বা দর্শনগত বিশ্বাসের দরুন বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়; এখানে সংস্কৃতি বা ধর্মীয় পরিচয়ের কোনও ভূমিকা নেই। হান্টিংটন বেশিরভাগই গল্প উপাখ্যানের উপর নির্ভর করেছেন। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর সময়ে আন্তসভ্যতা সংঘাতের ঘটনা মোটেই বৃদ্ধি পায়নি।

এডওয়ার্ড সাঈদ হান্টিংটনের থিসিসের জবাবে "The Clash of Ignorance" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেছেন, "Huntington's categorization of the world's fixed civilization omits the dynamic interdependency and

www.bjilibrary.com

interaction of culture. It is an example of an imagined geography where the presentation of the world in a certain way legitimates certain politics." প্রকৃত অবস্থাও তাই। একটি বিশেষ রাজনীতি ও আধিপত্যবাদের স্বার্থে তাঁর পুরো Clash theoryটি অনুপ্রাণিত বলে মনে হয়। তিনি এখানে সুনিপুণভাবে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে শিকারের লক্ষ্যবস্তু বানাতে চেয়েছেন।

বিশ্বের শীর্ষ একটি পরাশক্তি সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক প্রভাব, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কোন ক্ষেত্রেই যার জুড়ি বা প্রতিযোগী নেই সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামান্য একজন ব্যক্তির কথিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য একটি দুর্বল ও দরিদ্র দেশের উপর পরিপূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং দেশটি ধ্বংস করে দিল। এটা কি Clash of Civilization? আমার দৃষ্টিতে এটা Aggression on Civilization. পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিভূ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান নামক একটি অত্যন্ত অনুন্নত দেশের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করে তাকে ধ্বংস করে দিল এ কারণে যে ইসলামের নামে সে দেশের ছাত্রদের একটি দল একটি সরকার গঠন করে তার ভূ-খন্ডের নব্বই ভাগের বেশি শাসন করছিল। বলা বাহুল্য ইতোপূর্বে ঐ দেশটিতে বয়স্ক রাজনীতিবিদরা আত্মঘাতি কলহে লিপ্ত হয়ে দেশটিকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামলা করেছিল সেই তালেবান এবং বিন লাদেন এক সময় ছিল যুক্তরাষ্ট্রেরই সাহায্য পুষ্ট। আবার টুইনটাওয়ার ধ্বংসের সাথে বিন লাদেন কিংবা ইসলামপন্থীরা যে জড়িত ছিলেন গত ছয় বছরেও তার প্রমাণ মিলেনি। বরং তার সাথে ইহুদীদের যে সম্পৃক্ততা ছিল খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু তথাপিও ডামি প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করে ইসলাম ও মুসলমানদের উপরই হামলা হচ্ছে। আবার সভ্যতার সংঘাতের সাক্ষী হিসেবে যে ইরাকের কথা হান্টিংটন উল্লেখ করেছেন সে ইরাকের অবস্থাও ভিন্নতর নয়। ইরাকের উপর হামলা করা হয়েছিল Weapons of mass destruction রাখার অভিযোগে। ইরাক তা অস্বীকার করেছে। জাতিসংঘ তদন্ত কমিটি করলো, কিন্তু কমিটির রিপোর্টের তারা অপেক্ষা করলো না। পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুজাতিক সৈন্য সমাবেশ এবং অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে এই দেশটিকেও ধ্বংস করে দিল। এরপর তারাই ঘোষণা করলো ভুল হয়ে গেছে। ইরাকে মারণাস্ত্র ছিল না এবং সাদ্দাম হোসেনের সাথেও বিন লাদেনের সম্পর্কের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাহলে কেন এই রক্তপাত, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা?

এএফপির এক রিপোর্ট অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ যাবত ইরাকে যে রক্ত ঝরিয়েছে তা দিয়ে সে দেশে তৃতীয় আরেকটি নদীর সৃষ্টি হতে পারে। রিপোর্ট অনুযায়ী গোটা ইরাক আজ নিরাপত্তাহীন একটি দেশ। মৃত্যু এদেশটির প্রত্যেকটি স্থানে ওঁৎ পেতে রয়েছে। যে কোন মূহূর্তে যে কোন লোক বোমা বিস্ফোরণ বা গুলি বর্ষণের শিকার হতে পারে।

www.bjilibrary.com

একারণে ১৫ লাখ ইরাকী দেশ ত্যাগ করেছে। কত লোক মারা গেছে তার হিসাব নেই। মৃত ব্যক্তিদের দাফনের জন্য কবরস্থানে যায়গা নেই। মানবতার আর্তনাদ সেখানে আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভুল স্বীকার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব কি এর দায় থেকে মুক্তি পেতে পারে? এটা কি সভ্যতার সংঘর্ষ? টুইন টাওয়ারে হামলার জন্য বিন লাদেনকে দায়ী করে তাকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য একটি দেশ ও তার বাসিন্দাদের ধ্বংস করে একইভাবে এফবিআই এখন রিপোর্ট দিয়েছে যে টুইন টাওয়ারের হামলার সাথে বিন লাদেনের সম্পৃক্ততার কোনও প্রমাণ তারা পাননি। অর্থাৎ অভিযোগটি মিথ্যা ছিল। তাহলে কি দাঁড়ালো? ইরাকে Weapons of mass destruction থাকার অভিযোগ মিথ্যা, বিন লাদেনের টুইন টাওয়ারে হামলার অভিযোগ মিথ্যা। যারা অভিযোগ করেছেন তারাই এখন বলছেন তা মিথ্যা। আর হান্টিংটন এই মিথ্যা অভিযোগে চাপিয়ে দেয়া আফগান ও ইরাক যুদ্ধকে সভ্যতার দ্বন্দ্ব থিউরীর প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এবং তাঁর সহযোগিরা ইসলাম এবং মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাসের দায়ও চাপাচ্ছেন। যে কোনও বিচারে এটা বর্বরতারই লক্ষণ। অবশ্য এ সত্যটি যে হান্টিংটন নিজে জানেন না তা নয়। তিনি নিজে Youth Bulge Theory নামক আরেকটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। এতে তিনি বলেছেন–

"I don't think that Islam is any more violent than any other religion, and I suspect if you added it all up, more people have been slaughtered by Christians over the centuries than by muslims. But the key factor is the demographic factor. Generally speaking the people who go out and kill other poeple are males between the ages of 16 and 30."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুন রাহাজানিতে এমন কি স্কুল ছাত্ররাও যে কত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত তা সকলেরই জানা। যুব উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অপরাধ প্রবণতা পাশ্চাত্যের জীবনীশক্তিকে এখন ধ্বংস করে দিচ্ছে।

হান্টিংটন সভ্যতার দ্বন্দ্বের কথা বলছেন। ইসলামী সভ্যতার উপর সন্ত্রাস ও মানুষ হত্যার কল্পিত অপরাধ চাপাচ্ছেন। ইসলাম বহির্ভূত সভ্যতার অংশীদার দেশসমূহ সাম্প্রতিক অতীতে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার তথ্য লোমহর্ষক। কঙ্গো ফ্রি স্টেটে ১৮৮৬ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত বেলজিয়ামের নির্যাতনে ৬৫,০০,০০০ লোক নিহত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ৮৫,০০,০০০; রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে (১৯১৭-২২) ২৮,২৫,০০০; স্ট্যালিন শাসনামলে (১৯২৪-৫৩) ২,০০,০০,০০০; আবিসিনিয়ায় ইতালীর অভিযানে (১৯৩৫-৩৬) ১,৬০,০০০; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫) ৭,১০,০০,০০০; যুদ্ধোত্তর কালে পূর্ব ইউরোপ থেকে জার্মানদের বিতাড়নের ফলে ২৩,৮৪,০০০; চীনা গৃহযুদ্ধে

www.bjilibrary.com

(১৯৪৫-৪৯) ৩০,০০,০০০; মাওসেতুং এর শাসনামলে (১৯৪৯-৭৫) চীনে ৪,০০,০০,০০০; কোরিয়ান যুদ্ধে (১৯৫০-৫৩) ১২,০০,০০০; মার্শাল টিটোর শাসনামলে যুগোশ্লাভিয়ায় (১৯৪৪-৮০) ২,৫০,০০০; আলজিরিয়ায় ফরাসী নির্যাতনে (১৯৫৪-৬১) ১০,০০,০০০; ভিয়েতনামের উপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে (১৯৬৫-৭৩) ১০৩৩০০০; ক্যাম্বোডিয়ায় খেমাররুজ শাসনামলে (১৯৭৫-৭৮) ১৫,০০,০০০; সোভিয়েত আফগান যুদ্ধে (১৯৭৯-৮৯) ২০,০০,০০০; ইরান-ইরাক যুদ্ধে (১৯৮০-৮৮) ১০,০০,০০০; উপসাগরীয় যুদ্ধে (১৯৯০-৯১) ১,৫০,০০০ এবং বসনিয়ার যুদ্ধে (১৯৯২-৯৫) ২,৮০,০০০ সামরিক ও বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে (সূত্র ঃ Britannica & other internet sources including http://userserols.com/mwhite28/warstatx.htm)। এর যোগফল দাড়ায় ১৬ কোটি ২৭ লক্ষ ৮২ হাজার। এই সংখ্যা বৃটেনের ন্যায় প্রায় তিনটি দেশের জনসংখ্যার সমান। এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটেছে একটি শতাব্দীতে, বিংশ শতাব্দীতে এবং এতে ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পৃক্তি ছিলনা। ইরান-ইরাক যুদ্ধ ও উপসাগরীয় যুদ্ধও হয়েছে মার্কিন ইংগিতে। এই যুদ্ধ এবং ধ্বংসযজ্ঞকে মানসিক বিকারগ্রস্ত ছাড়া কেউ কি সভ্যতার লড়াই বলবেন? হান্টিংটন চাতুর্যের সাথে শেষোক্ত দু'টি যুদ্ধ ছাড়া বাকী গুলোকে সভ্যতার লড়াই এর সাথে যুক্ত করেননি। এসব যুদ্ধ ও হত্যা লীলার শিক্ষা কি ইসলামের সাথে অপরাপর সভ্যতাসমূহের যুদ্ধের ইংগিত দেয়? অবশ্যই না। প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ইসলামকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে খাড়া করে তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য Clash theory, War on Terror প্রভৃতি নানা Program throw করছে। তার এ চাল ধরা পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ইসলামের বিরুদ্ধে আরেকটি ফ্রন্ট ও খুলেছে। ২০০৫ সালের ২৫ এপ্রিল US News and World Report "Hearts, Minds and Dollars" শীর্ষক একটি নিবন্ধ ছেপেছে। ১০০ বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও গবেষণা রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং কেভিন হোয়াইটল ও জুলিয়ান ই বার্নেসসহ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় নিবন্ধকার ডেভিড ই কাপলান ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রভাবান্বিত করার লক্ষ্যে কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইসলামের চেহারা বদলিয়ে দেয়ার একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। এই নিবন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে– "America can no longer sit on sidelines as radicals and moderates fight over the future of a politicized religion with over a billion followers. The result has been an extraordinary and growing effort to infuence what officials describe as Islamic

ইসলামের চেহারা পরিবর্তনের সর্বশেষ মার্কিন কৌশলটির নাম দেয়া হয়েছে Muslim World Outreach. স্বয়ং হোয়াইট হাউস এই কৌশল বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। এই কৌশলের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

www.bjilibrary.com

- ইসলামের অভ্যন্তরে কি ঘটছে তা খুঁজে বের করা।
- ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পশ্চিমা ধারণার বিস্তার।
- নারী অধিকারের প্রসার বিশেষ করে স্বাধীনতা ও মুক্ত মেলামেশা জনপ্রিয় করণ।
- মুসলমান মিত্র দেশসমূহ, বেসরকারী ফাউন্ডেশন এবং অলাভজনক সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান।
- মধ্যপন্থীদের হাতকে শক্তিশালী করণ।
- সুফিবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্কার পন্থীদের সহায়তা করা।
- মিশরের ইখওয়ানুল মুসলেমীনের ভালবাসা অর্জন।
- পাকিস্তানের দেওবন্দী আলিমদের সাথে যোগাযোগ।
- অনুকূল ফতোয়া দেয়ার জন্য পাকিস্তানী আলিমদের তহবিল সরবরাহ।
- প্রতিযোগীদের ফাঁদে ফেলার জন্য ভুয়া জিহাদী এলাকা তৈরি।
- মাদ্রাসাসমূহের মুকাবিলায় বিশেষ করে পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- মুসলিম দেশসমূহের স্কুলের পাঠ্যসূচী পরিবর্তন।
- মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রভাবিত করা।
- ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

এখানে উল্লেখ্য যে অতীতে উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য ইউরোপীয়রা বিভিন্ন মুসলিম দেশ দখল করেছে কিন্তু তারা ইসলামকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেনি। এমনকি মুসলমানদের দুর্দিনে, মোঙ্গল আক্রমণের সময় আলিমদের উপর অত্যাচার এবং লাইব্রেরির পুস্তকে অগ্নি সংযোগ করা হলেও তারা ইসলামের চেহারা পরিবর্তনের কোনও চেষ্টা করেনি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করছে।

অর্থাৎ এটা এখন পরিষ্কার যে ইসলাম এবং তার অনুসারীদেরকেই পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী রাষ্ট্র ও সরকারগুলো পথের কাঁটা বলে মনে করে। এই কাঁটা দূর করার জন্য তারা শুধু Clash theory'র উপর এখন ভরসা করতে পারছেনা, ভেতর থেকে তাকে কিভাবে উৎখাত করা যায় সে কৌশল বাস্তবায়নেও তারা বদ্ধপরিকর। তারা কি তা পারবে?

হান্টিংটনের Clash doctrine, একবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ধর্মান্তর ও ইসলাম গ্রহণ, ইউরোবিয়ার আত্ম প্রকাশ কিংবা লন্ডনিস্তান প্রতিষ্ঠা অথবা ইসলামের অভ্যন্তরে ঢুকে তার চেহারা পরিবর্তন করার পরিকল্পনা ও কৌশল যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয় তা হলে দেখা যাবে যে একমাত্র ইসলামাতংকের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি

www.bjilibrary.com

হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোক কিংবা পাশ্চাত্যের অন্য যে কোন দেশ, এদের একটি বিরাট অংশ ইসলামকে ভয় পায়। ভুল বুঝাবুঝিই এর কারণ। তাদের এই ইসলামবিদ্বেষ বা ইসলামাতংক মার্কিন বা পাশ্চাত্য বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে। পারস্পরিক এই বিদ্বেষ এমন একটি দুষ্ট চক্রের সৃষ্টি করছে যার ফলে মানব জাতির উল্লেখযোগ্য দু'টি অংশ পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হচ্ছে যা আমাদের কাম্য হতে পারে না। ইসলাম ও মুসলমানদের সমালোচনা করা আর ঈমান ও ঈমানদারদের উপহাস বিদ্রূপ করা এক কথা নয়। ইসলামকে একটি জংগী ও অসহিষ্ণু ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন এবং তার নাম নিশানা মুছে ফেলার পরিকল্পনা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। তারা সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান চায়।

ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস এক শতাব্দীর নয়। কিংবা সভ্যতার ইতিহাসও ১৫০০ সাল থেকে শুরু হয়নি (হান্টিংটনের ন্যায় পণ্ডিতরা ১৫০০ সালের আগের ইতিহাসকে আনতে চাননা)। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর ধরে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের বিচরণ ঘটছে। এর মধ্যে মুসলমানরাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশসহ ভারতবর্ষ ও স্পেনে কয়েক শতাব্দী ধরে শাসন করেছে। তারা সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসের দোষে কখনো দোষী হয়নি। হঠাৎ করে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে তারা সন্ত্রাসী জংগী হয়ে যেতে পারে না। আবার যারা যুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করছে তাদেরকেও মুসলিম জংগী বলা যায় না। সন্ত্রাস নৈরাজ্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে দুনিয়াব্যাপী ইসলামের প্রসার ঘটেনি। পাশ্চাত্যের বহু দার্শনিক, লেখক, গ্রন্থকার ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতার প্রশংসা করেছেন। তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞান ও জীবন দর্শন এবং আধুনিক ইউরোপ গঠনে ইসলামের অবদানকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন।

Marquis of Dufferin বলেছেন, "It is to mussalman science to mussalman art and to Mussalman literature that Europe has been in a great measure indebted for its extrication from the darkness of the middle ages অর্থাৎ মধ্য যুগের তমসা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইউরোপ বেশিরভাগই মুসলিম কলাকৌশল, মুসলিম বিজ্ঞান ও মুসলিম সাহিত্যের কাছে ঋণী।

আবার জন উইলিয়াম ড্রেপার তাঁর History of Intellectual Development of Europe পুস্তকে লিখেছেন, The Quran abounds in excellent moral suggestions and precepts, its composition is so fragmentary that we cannot turn to a single page without finding maxims of which all men must approve. This fragmentary construction yields texts and mottos and rules complete in themselves suitable for common men in any of the incidents of life.

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন চমৎকার নৈতিকমূল্যবোধ ও আদেশ-নিষেধে ভরপুর। এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে সারগর্ভ বাক্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যা প্রত্যেক মানুষের জন্যই অনুসরণযোগ্য। এর প্রত্যেকটি খণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিবাক্য, মৌলিক রচনা ও বিধি বিধান রয়েছে যা সাধারণ মানুষের জীবনের যে কোন অবস্থার সাথে সংগতিশীল ও অনুসরণযোগ্য।

ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি ও অগ্রগতির উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে JH Dennison তাঁর রচিত Emotion As the Basis of Civilization পুস্তকে লিখেছেন :

Muhammad had created a religion which had none of the features of the ancient cults, no priesthood and no ceremonial which was based on no form but upon a spiritual relationship to an unknown God. It was not designed to give prestige to a special group but to a universal brotherhood composed of all men of every race who would accept this God and promise loyalty to his prophet.

The vast difficulty of creating any sense of unity of solidarity in such a group is apparent. All historians declare that the amazing success of Islam in dominating the world lay in the astounding coherence or sense of unity in the group but they do not explain how this miracle was worked. There can be little doubt that one of the most effective means was prayer. The five daily prayers, when all the faithful, wherever they were, alone in the grim solitude or in vast assemblies in crowded city, knelt or prostrated themselves toward Mecca uttering the same words of adoration for the one true God and of loyalty to His prophet, produce an overwhelming effect even upon the spectators and the psychological effect of thus fusing the minds of the worshipers in a common adoration and expression of loyalty is certainly stupendous. Muhammad was the first one to see the tremendous power of public prayer as a unification culture and there can be little doubt that the power of Islam is due to a large measure to the obedience of the faithful to his inviolable rule of the five prayers.

অর্থাৎ "মুহাম্মাদ (সা) এমন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন যার মধ্যে প্রাচীন ধর্ম পদ্ধতির কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। এতে কোনও পুরোহিততন্ত্র বা আনুষ্ঠানিকতা নেই। ধর্মটি প্রতিমূর্তিভিত্তিকও নয় বরং এক অদৃশ্য খোদার সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি

www.bjilibrary.com

করে এটি গড়ে উঠেছে। কোনও বিশেষ দল বা গোষ্ঠীকে সম্মানিত করার অভিসন্ধি এই ধর্মে নেই; বরং বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে এক খোদার উপর ঈমান আনয়নকারী এবং তাঁর নবীর আনুগত্য স্বীকারকারী সকল মানুষের সমন্বয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা এর লক্ষ্য। এ ধরনের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি ও ঐক্যের অনুভূতি গড়ে তোলা যে একটি কঠিন কাজ তা সুস্পষ্ট। সকল ঐতিহাসিক দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে বিশ্ব শাসনে ইসলামের সাফল্যের পেছনে ছিল তার অনুসারীদের বিস্ময়কর ঐক্য ও সংহতি। কিন্তু তাদের কেউই এই অলৌকিক কাজটি কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তার ব্যাখ্যা দেননি। এতে সামান্যতম সন্দেহ থাকতে পারে না যে এই লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম পন্থা ছিল নামায। মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন, ভয়ানক নির্জনতা-নিঃসঙ্গতা অথবা ব্যস্ত শহরে জনতার ভিড়ে, তাঁরা যখন কেবলামুখী হয়ে একসাথে রুকু-সিজদা করে একই ভাষায় এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর স্তুতি গায় এবং তাঁর নবীর (সা) আনুগত্য প্রকাশ করে তখন এমনকি দর্শকরাও অভিভূত হয়ে পড়েন। এভাবে একটি সাধারণ আরাধনা ও আনুগত্য প্রকাশের মধ্যে ভক্ত অনুরক্তদের বিগলিত অন্তরের ঐক্যের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্ময়কর। মুহাম্মাদ (সা) হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ঐক্যের সংস্কৃতি হিসেবে গণ আরাধনার বিশাল শক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অলংঘনীয় বিধিবিধানের প্রতি মুমিনদের আনুগত্যের মধ্যেই ইসলামের শক্তির বেশিরভাগ নিহিত রয়েছে।"

একইভাবে মুসলমানদেরকে ধর্মোন্মাদ আখ্যায়িত করে তারা বিজিত জাতিসমূহকে তরবারির ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরে বাধ্য করার অভিযোগকে De Lacy O'leary তাঁর 'Islam at the Crossroad' শীর্ষক পুস্তকে উদ্ভট হাস্যকর আজগুবি পৌরাণিক কাহিনীর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"History makes it clear, however, that the legend of fanatical Muslim sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered race is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated."

মুসলিম মিল্লাতের করণীয়

হান্টিংটনের সভ্যতার দ্বন্দ্ব থিওরী এবং ইসলাম ও মুসলমাদের উপর চতুর্মুখী হামলার প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অপরিসীম। এই দায়িত্ব শুধু মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব নয়। সভ্যতার ভিত্তিতে যদি সংঘাত যুদ্ধ শুরু হয় এবং তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে তা হলে শুধু মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র সভ্যতা নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ও তার অনুসারীরা মানব জাতিকে এই বিপর্যয়ের

www.bjilibrary.com

মুখে নিক্ষিপ্ত হতে দিতে পারে না। এজন্য মুসলিম মিল্লাতকে তার সত্যিকারের পরিচয় খুঁজে বের করতে হবে। পাশ্চাত্যের অন্ধঅনুকরণে মত্ত ব্যক্তিদেরও এখন আত্মোপলব্ধির সময় এসেছে। হান্টিংটনের থিওরী যে কয়টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার একটি হচ্ছে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই বর্ধিত সংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যে হান্টিংটনের মতো পাশ্চাত্যবাসীদের ন্যায় ইসলামের সাথে দুশমনী করছে এটা তাদের অজানা নয়। তথাপিও তারা এই সংখ্যাকে ভয় পায়। নামে নামে জমে টানে এই প্রবাদের অনুসরনে বর্নচোরা মুসলমানদেরও ইসলামের প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এ অবস্থায় তাদের আত্ম পরিচয় খুঁজে বের করে মুনাফেকী পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যবাসীরাও তাদের পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করছে। হান্টিংটন বিশেষ ভাবে এই উপলব্ধির কথা উল্লেখ করেছেন।

পাশ্চাত্যের পরিচয় হারিয়ে ফেলার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হবার পর থেকেই তাদের ইতিহাসে অনেকগুলো বিপর্যয় ঘটেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মীয় নেতাদের অত্যাচারে ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ইউরোপ যখন তথাকথিত Age of Reason এ প্রবেশ করে তখন ডেকার্ট, হিউম, কান্ট, ভলতেয়ার, গোয়েথে ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের ন্যায় নেতৃস্থানীয় পন্ডিত ব্যক্তিরা খৃস্টীয় মতবাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তখনো তারা নাস্তিক ছিলেন না। ধর্মীয় যাজকদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, চরমপন্থা, তপশ্চর্য্যা, কৃচ্ছতা, আবিষ্কার উদ্ভাবন সহ জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জীবন যাপনের আধুনিক উপকরণকে ধর্মের পথে প্রতিবন্ধকতা বলে বিশ্বাস এবং তার সক্রিয় বিরোধিতা মৌলবাদের জন্ম দেয়। ইউরোপসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে দীর্ঘকাল ধরে ধর্মের নামে মানুষের উপর অত্যাচার অবিচার এবং অধর্ম চালিয়ে যাবার ফলে উদ্ভুত অবস্থার আলোকে ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ ধর্মের কথিত মৌল বিষয়গুলোর প্রতি মানুষের যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল তা থেকেই এই মৌলবাদের জন্ম। এই মৌলবাদীরা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি এতই অসহিষ্ণু ছিল যে বহু বিজ্ঞানী নিছক উদ্ভাবনী কাজের জন্য তাদের হাতে নিগৃহিত হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে খৃস্টানদের মধ্যে যারা যীশুর খোদা হওয়ার কিংবা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করতেন না এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্বতে সম্মান দিয়ে গীর্জার সংকীর্ণতা থেকে তাদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন নাস্তিকতার প্রসার কখনো তাদের লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নিৎসে "Death of God" ঘোষণা করেন এবং মার্কসবাদ সরকারীভাবে নাস্তিক্যবাদী মতবাদে পরিণত হয়। এটা অনিবার্য ছিল; কেননা এর মধ্যে তারা মানুষকে সবকিছুর মান দণ্ডের মর্যাদায় বসিয়ে শিরকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। পাশ্চাত্য সমাজ মানুষকে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে দেবতার আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উগ্রজাতীয়তাবাদ, নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ, সমাজতন্ত্র,

www.bjilibrary.com

কম্যুনিজম এবং উদারনীতিবাদ এর সব কিছুই পাশ্চাত্যের সৃষ্টি। বিশ্বের ইতিহাসে পাশ্চাত্যই হচ্ছে একমাত্র অঞ্চল যেখানে সর্ব প্রথম অজ্ঞেয়বাদ বা নাস্তিক্যবাদকে সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারা একদিকে খৃস্টীয় ঐতিহ্য থেকে সুবিধা নিচ্ছে অপর দিকে বাস্তব ও আক্ষরিক অর্থে খৃস্ট ধর্মকে বর্জন করেছে। এভাবে পাশ্চাত্য তাদের Transcendental moorings সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে। ব্যক্তির চরম ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকে যদি একবার সর্বোচ্চ সামাজিক অগ্রাধিকার দেয়া হয় তাহলে অর্থনীতির ব্যবহার বিধি স্বাভাবিকভাবেই সর্বগ্রাসী হয়ে পড়ে। যে কোনও পন্থায়ই হোক উপার্জন ও উৎপাদন বৃদ্ধিই পাশ্চাত্যের এখন প্রধান লক্ষ্য। এখানে নৈতিক অনৈতিক বলে কিছু নেই। অর্থ উপার্জন ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তাদের কাছে স্ত্রী, কন্যা, মাতা ভগ্নির কোনও প্রশ্ন নেই। মুক্ত পাশ্চাত্যবাসীরা নিজেকে উপলব্ধি করতে তার মানবিক মর্যাদাকে হারিয়ে পাশবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্থূল বস্তুবাদ পরিবার প্রথাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যতগুলো বিয়ে হয় তার মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশের টিকে থাকার সম্ভাবনা থাকে। অনেক দেশে বিবাহ প্রথা উঠে গিয়ে লিভ টুগেদার সংস্কৃতি ছাড়াও সমলিংগে বিয়ের রেওয়াজ চলছে। লক্ষ লক্ষ নারী বিয়ে ছাড়াই মা হচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক পিতৃহীন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত জারজ ছেলে-মেয়েরা যখন সমাজের মাথায় অবস্থান নেয় তখন কি ঘটে তা সহজেই অনুমেয়। পর্ণোগ্রাফী সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। এই অবস্থায় হান্টিংটনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যখন নিজেদের পরিচয় খুঁজে পাবার জন্য প্রতিপক্ষ খুঁজে বেড়ান এবং নিজেদেরকে সভ্য বলে দাবী করেন তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই সভ্যতা কি আমরা গ্রহণ করতে পারি? অবশ্যই না। কিন্তু আমি আপনি যতই না বলি না কেন মুসলিম মিল্লাতের মধ্যেই একটা শ্রেণী আছে যারা বর্বর পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং শাসকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নামে এবং বংশ পরম্পরায় মুসলমান হলেও পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী, ইসলামকে মৌলবাদ বলে গালি দেয়। অন্যদিকে আলিমদের বৃহত্তর অংশ নির্লিপ্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত। এ অবস্থায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করণীয় নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

ইসলামে অন্ধ বিশ্বাস, অসহিষ্ণুতা বা চরমপন্থার কোনও স্থান নেই। ধর্মীয় সংকীর্ণতার মূলেও এখানে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। জেনে শুনে ইসলামকে জানা, তার মৌলিক স্তম্ভসমূহের উপর ঈমান আনা, তার হুকুম আহকাম মানা এবং প্রজ্ঞা ও বিনয়ের সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা নিজে অনুসরণ এবং অন্যদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করাসহ তার মৌলিক আকিদাসমূহের উপর বহাল থাকা অপরিহার্য। ইসলামের নবী (সা) শুধু মুসলমানদের জন্য আসেননি। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন" অর্থাৎ "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" একইভাবে মুসলিম জাতি ডান, বাম অথবা চরম

www.bjilibrary.com

কোনও পন্থীই নয়। পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, "ওয়া কাজালিকা জায়ালনাকুম উন্মাতান ওয়াসাতান লি তা কুনূ শুহাদা আ আলান্নাছ ওয়া ইয়াকুনার রাসূলু আলাইকুম শাহিদা" অর্থাৎ আর এইভাবে আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্য পন্থী উম্মাত বানিয়েছি যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল (সা) সাক্ষী হন তোমাদের উপর।

উম্মাতে ওয়াসাত বা মধ্যপন্থী উম্মাত কথাটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে অন্য কোন ভাষার অপর কোন শব্দ দ্বারা এর সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা যায় না। এ দ্বারা এমন এক উচ্চ উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানব দল বুঝায় যা সুবিচার ন্যায়-নীতি ও মধ্যম পন্থা অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা বিশ্বের জাতিসমূহের পথ প্রদর্শক, অগ্রনায়ক ও পরিচালক হওয়ার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এটা এক দিকে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক অন্যদিকে তেমনি প্রচণ্ড দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার ইঙ্গিতবহ। এ প্রেক্ষিতে মিল্লাতের দায়িত্ব তিনটি–

এক.

বিশ্বব্যাপী সংঘাত-সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক শক্তিকে ঠেকানোর জন্য আন্তঃধর্ম সংলাপ অব্যাহত রাখা এবং ইসলামের পক্ষ থেকে তার শিক্ষা ও মূল্যবোধ তুলে ধরে এই আশ্বাস দেয়া যে ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের সম্পর্কে যে ভীতির সৃষ্টি করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ অমূলক। দূরত্ব যত বেশি থাকে ভুল বুঝাবুঝি তত বেশি হয়। এই দূরত্ব কমানোর জন্য আন্তঃধর্ম সহযোগিতা নিশ্চিত করা দরকার।

দুই.

রাসূল (সা) বলেছেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে দু'শ্রেণীর লোক রয়েছে। তারা যদি সৎ পথে চলে উম্মাহ সৎ পথে চলবে। তারা যদি বিপথগামী হয় উম্মাহও বিপথগামী হবে। এরা হচ্ছে শাসক এবং আলিম উলামা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী।" এ হাদিসটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেনা। ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের জন্য শাসকশ্রেণীর সাথে যেমন সংলাপ প্রয়োজন, তেমনি ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন সমূহের অনুশীলনের মাধ্যমে সততা নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপনও জরুরী। পাশাপাশি ন্যায়নিষ্ঠ ইসলামী মূল্যবোধে সমৃদ্ধ দল ও ব্যক্তিদের নেতৃত্বে আসীন করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে।

তিন.

প্রকৃত মূল্যবোধ তুলে ধরা এবং মিডিয়ার অপপ্রচার প্রতিরোধের জন্য লেখক, সাংবাদিক, কলামিস্ট, ওয়ায়েজীন প্রভৃতি পেশায় পারদর্শী লোক তৈরি, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক উভয় মিডিয়ার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত ও ইসলামী করণের উদ্যোগ গ্রহণ। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি দরকার তা

www.bjilibrary.com

হচ্ছে আলিম উলামাদের ঐক্য। তাদের ঐক্য হলে ইসলামপন্থীরাও ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর কোনও নবী বাধা বিপত্তি থেকে রেহাই পাননি। আমরা নবী নই, কাজেই আমাদের জন্য আরো বেশি বাধা আসবে।

এখন কথা হচ্ছে Clash Theory-কে আমরা ভয় করবো কিনা। আমি মনে করিনা যে এতে ভয় করার মতো কিছু আছে। একটা ফিৎনা হিসেবে অবশ্যই এটি ঘৃণা করার মতো। খোদ পাশ্চাত্য জগত অথবা প্রাচ্যে তাদের কোন মিত্র এই থিওরীকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ২০০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী সারা বিশ্বের ৬০০টি স্পটে জর্জ বুশের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে ১২-১৫ মিলিয়ন মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ইরাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের রায় দিয়েছে। আনবিক শক্তিধর দেশগুলো যাদের যুক্তরাষ্ট্র মিত্র বলে মনে করে তাদের বাসিন্দাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশ, আফ্রিকান ইউনিয়নের ৫৩টি দেশ, সার্কের ৮টি দেশ, আসিয়ানের ১০টি দেশ সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার ৬টি দেশ, ল্যাটিন আমেরিকান সহযোগিতা সংস্থার ২০টি দেশ ও ওআইসির ৫৬টি দেশ তাদের পারস্পরিক সহযোগিতাভিত্তিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হান্টিংটনের লড়াই-এ ঝাঁপিয়ে পড়বেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেকেই মনে করেন যে সাম্রাজ্যের উত্থানের ন্যায় পতনও অনিবার্য। যে কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছিল, সেই একই কারণ গুলো মার্কিন আধিপত্যবাদকেও পেয়ে বসেছে। এটা হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও নৈতিক অবক্ষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ্যারিকেন-ক্যাট্রিনার ন্যায় সামান্য একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলা করতে গিয়ে দুনিয়ার সামনে নিজেকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করেছে, সভ্যতার লড়াই করার মতো যোগ্যতা তার কোথায়? এক ইরাক যুদ্ধে তার বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীন দেনার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। সভ্যতার লড়াই তার ভঙ্গুর অবকাঠামোকে যে ধাক্কা দেবে তা সামলানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে যেমন আফগানদের উপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের ধাক্কায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়েছিল। কোন কোন বিশ্লেষকের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে এবং এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সামরিকভাবে তার উত্তরাধিকারী হতে পারে।

ইসলামবিরোধী অপপ্রচারে জিহাদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জিহাদ অর্থ যে কতল নয় বরং শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা এবং মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রয়াস– তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। যুদ্ধ অর্থে যে জিহাদ তা ঘোষণা করার অধিকার যে কেউ যে সংরক্ষণ করে না, দেশ বিদেশে তার ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। এ কাজগুলো আমাদেরই করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সরকারগুলোকে মটিভেট করার উদ্যোগও গ্রহণ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

সুন্নাহর দৃষ্টিতে যে কাজগুলো ফরয ওয়াজিব কোনটাই নয় সেগুলোর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোনও কল্যাণ আনতে পারে না। যে সব গোঁড়ামী ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করছে সেগুলো পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। ইসলামের সার্বজনীন একটি বৈদেশিক নীতি আছে। ফিকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী আমরা যখন দারুল ইসলামের বাইরে যাই তখন নিজেদের মৌলিক ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ পালন করার অনুমতি সাপেক্ষে স্থানীয় আইন কানুন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের আচার আচরণে যাতে অমুসলমানরা আকৃষ্ট হতে পারে তাদের চরিত্রে সে রকম বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়। নিজেদের চারিত্রিক গুণাবলী দিয়ে যদি আমরা ইসলামের একটা মডেল দাঁড় করাতে পারি তাহলে অপপ্রচার যতই শক্তিশালী হোক না কেন তা কোনও কাজে আসবেনা বরং নাইন-ইলেভেনের আরোপিত ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার যুবক যুবতিকে যে ভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

আগেই বলা হয়েছে যে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ও কমিউনিস্ট ব্লক ভেঙ্গে যাবার পর পুঁজিবাদী বিশ্ব ইসলামকেই তাদের একমাত্র আদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে এবং ইসলামের উত্থান ঠেকানোকে তারা তাদের প্রধান এজেন্ডাভুক্ত করে নেয়। কুরআনের বিকৃত অর্থ করে যদি মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলা যায় তাহলে ইসলামের উত্থানকে রোধ করা সম্ভবপর। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইসলাম বৈরী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো এগুচ্ছে। তারা কুরআন শরীফের ১০০টি আয়াতকে চিহ্নিত করে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে বিনা কারণে বিধর্মীদের হত্যা করা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল মুসলমানদের জিহাদী দায়িত্ব। অথচ আখিরাতে বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের অধীনে বিচারের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও যুদ্ধাবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থানেই মানুষ হত্যার প্রশ্নই উঠে না। এই হত্যা তাদের জন্য মহাপাপ, সমগ্র মানব জাতিকে হত্যার শামিল। সূরা আল মায়েদার ৩২নং আয়াতে বলা হয়েছে। "এই কারণেই আমরা বনি ইসরাইলের প্রতি এই ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে যদি কেউ কোন খুনের পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। আর যদি কেউ কাউকে জীবনদান করে তবে সে যেন সমগ্র মানুষকে জীবন দান করলো।" যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনও মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, অভিসম্পাৎ করেন এবং তার জন্য ভয়ঙ্কর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। "তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে হত্যাকারীর ফরয নফল কোন ইবাদাতই কবুল হয় না।" বুখারী শরীফের আরেকটি হাদীসে আছে, "রাসূল (সা) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম মানুষ হত্যার বিচার হবে।" তিরমিযী শরীফের আরেকটি হাদীসে আছে। "রাসূল (সা) বলেছেন, একজন মুসলমান হত্যা করা অপেক্ষা আল্লাহর দরবারে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করা সমধিক সহজ।" মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীসে

www.bjilibrary.com

আছে, রাসূল (সা) বলেছেন, "সাতটি জিনিস মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে, তার মধ্যে দু'টি হচ্ছে যথাক্রমে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা এবং কাউকে হত্যা করা।" মুসলমানরা যদি হত্যার রাজনীতি করতেন তাহলে ভারত বর্ষে তাদের আটশত বছরের শাসনে কোনও অমুসলমান বেঁচে থাকতে পারতো না।

উপরোক্ত অবস্থায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার লক্ষ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এজন্য প্রচার মাধ্যমের কোনও বিকল্প নেই।■

লেখক-পরিচিতি : লেখকের 'গ্রামীণ ব্যাংক : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২১শে এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.bjilibrary.com

দুর্নীতি : এর নানা রূপ, কারণ ও প্রতিকার

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

■

Honesty is the best policy - সততাই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি। ইদানিং এ প্রবাদতুল্য বাক্য পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। কিছুদিন পূর্বেও Honesty is the best policy-র পুষ্টিকর খাবার তো দূরের কথা, ভাতও জুটতো না। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে ১ম হবার অনেকবার গৌরব (!) অর্জন করেছিল বাংলাদেশ। এতে করে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের মুসলিমরা ব্যাপকভাবে Honesty is the best policy-কে যে প্রত্যাখ্যান করেছিল বা করেছে তা ১ম হবার গৌরব (!) অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে।

রাজনীতিবিদ, সরকারী আমলা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্মচারী সহ সার্বিক পেশার মধ্যে দুর্নীতির এত সামাজিকীকরণ হয়েছে যে কোথাও কোথাও দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলে আর চেনা যায়না। দুর্নীতিকে চিহ্নিত করাতো দূরের কথা, বরং দুর্নীতিকে সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুর্নীতির উন্নতির এ খরস্রোতকে যারা রুখে দিতে জিহাদের ডাক ইতোপূর্বে দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই এখন দুর্নীতির বড় বড় দিকপাল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। অনেকে প্রতিষ্ঠার পথে আছেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে দেশে নতুন করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে।

দেশের দুর্নীতির এই হালফিল, লড়াইকারীদেরকে একসময় হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে আর কখনো কখনো নিজেরাই দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম স্থান পেয়ে যান। দুর্নীতির সামাজিকরণের নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা ছাড়া

www.bjilibrary.com

তাদের কিছুই করার থাকে না আর। লড়াইকারীদের এই করুণ পরিণতির জন্য জাতীয়ভাবে দুর্নীতির সামাজিকীকরণ যেমন দায়ী, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দুর্নীতির অবাধ কদর কম দায়ী নয়। একদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বের মোড়ল, আন্তর্জাতিক পুলিশী রাষ্ট্র, বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি বলে খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে সমাজবাদী বা সাম্যবাদী বিশ্বের একমাত্র কর্ণধার চীনের দুর্নীতির সাম্প্রতিক দুটো প্রতীকি নমুনা থেকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে বিশ্বের মোড়লরা কিভাবে আকণ্ঠ ডুবে আছে দুর্নীতিতে।

ওয়াশিংটন থেকে এএফপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ : যুক্তরাষ্ট্রে এক আইনজীবি ও দুই বিচারক ঘুষ প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত (এপ্রিল, ২০০৭)। বেইজিং থেকে এএফপি পরিবেশিত আর এক খবরে প্রকাশ : 'চীনে দুর্নীতির দায়ে ৩ বিচারকের জেল' (মার্চ ২০০৭)।

বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে সাধারণ মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। আর বিশ্বের দুই মোড়ল দেশে সেই বিচার ব্যবস্থা কী ভয়াবহ দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন তা অনুধাবনের জন্য ঐ খবর দুটোই যথেষ্ট। আর আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থাও যে বিতর্কের উর্ধে নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ খুব কঠিন নয়।

দুর্নীতি সকল ধরণের উন্নয়নের ঘোরতর প্রতিপক্ষ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশ, ঐতিহ্য, স্থায়িত্ব এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হচ্ছে রাজনৈতিক দুর্নীতির নগদ ফলাফল। নির্বাচনী এবং নীতি ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা সমূহের দুর্নীতি জবাবদিহিতার মূল্যবোধকে ধ্বংস করে এবং পক্ষপাতমূলক অসংখ্য দুর্নীতি সহায়ক নীতির জন্ম দেয়। বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি আইনের শাসনকে পণ্যে পরিণত করে। ন্যায়বিচার উচ্ছেদ হয়। নীরবে নিভৃতে কাঁদে নির্যাতিত মানবতা আর অত্যাচারী হাসে অট্টহাসি। জন প্রশাসনে (Public administration) দুর্নীতি মানুষের বর্ণনাতীত হয়রানি বৃদ্ধি করে, মানুষকে সর্বস্বান্ত করে। সরকারের বিধি সমূহ সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত নতুন অলিখিত বিধি চালু হয়। সার্বিকভাবে দুর্নীতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে কেনাবেচার পণ্যে পরিণত করে এবং দেশের সম্পদ পাচারে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সুযোগ সৃষ্টি করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দুর্নীতিবাজদের অর্থের পাহাড় নিজ দেশে না হয়ে ভিন্ন দেশে এই জন্যই হয় যে, পাচারকৃত সম্পদ যেন নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে। কেউ যেন ভাগ না বসায়। দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তারের ফলে বেসরকারী পর্যায়ে ব্যবসায়িক পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি যেমন ঘটে, তেমনি সরকারী পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে বৈধ সরকারও অবৈধ সরকারে পরিণত হয়ে যায়।

মানুষের জীবনেই নীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন জড়িত। কোন পশু, পাখী বা জলজ প্রাণীর মধ্যে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর। দুর্নীতির প্রশ্নে মানুষই একমাত্র কেন্দ্রিয় চরিত্র। মানুষ নৈতিক সত্তার (ভাল-মন্দ বিচারের বোধ সম্পন্ন সত্তা) অধিকারী হওয়ার কারণেই আবহমান কাল হতে নীতি-দুর্নীতির সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। মানুষ ব্যতীত

www.bjilibrary.com

অন্যান্য জীব বা প্রাণীর সত্তা শুধুমাত্র জৈবিক। জৈবিক তাড়নাই তার একমাত্র চালিকা শক্তি। অন্যদিকে মৈতিক তাড়নাই মানুষের মূল চালিকা শক্তি। তাই একমাত্র মানুষকেই পৃথিবীর সবদেশে নীতি-দুর্নীতির মানদন্ডে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নীতি ও দুর্নীতির পরিচয় কী? রূপ কী?

নীতির পরিচয় বলতে সৎনীতি বা উৎকৃষ্ট নীতি বা সত্যনিষ্ঠ, নির্ভুল বা পূর্ণাঙ্গ ত্রুটিমুক্ত ও কল্যানকর নীতিকেই বুঝায়। বলা বাহুল্য মানুষের পক্ষে ত্রুটিমুক্ত নীতি রচনা করা সম্ভবপর হয়না।

অন্যদিকে দুর্নীতির পরিচয় হচ্ছে ঃ

১। **ক্ষমতার অপব্যবহার** : ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতাকে ব্যবহার করা। ব্যক্তির অসততা এর উৎস হলেও এ পর্যায়ের দুর্নীতি, প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

২। **আর্থিক সুবিধা লাভ** : ব্যক্তিগত অসততা, অসাধুতা বা পাপাচারের মাধ্যমে কোন সুবিধা ভোগ করা বা অর্জন করা বা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হওয়া। এ পর্যায়ের দুর্নীতি ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ব্যক্তির সততা-অসততা এ পর্যায়ের দুর্নীতির জন্য দায়ী। ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় এখানে গৌণ ভূমিকা পালন করে।

৩। **জাল করা** : যে কোন দলিল বা ডকুমেন্ট জাল করে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা। এ পর্যায়ের দুর্নীতি ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অসাধুতার ফসল।

৪। **দুর্নীতিগ্রস্ত করা** : ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিকে ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দুর্নীতিগ্রস্ত করা বা কোন ব্যক্তিকে দুর্নীতিপরায়ণ হতে বাধ্য করা। এ পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক।

৫। **স্বার্থবোধকতার মাধ্যমে দুর্নীতি** : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় ক্ষমতা অর্জনের স্বার্থে যে কোন দলিল-প্রমানাদি, আইন বা বিধির মধ্যে ভাষাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থে বিকৃতি ঘটানো। এ পর্যায়ের দুর্নীতি একটি দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট জুড়ে সাধিত হয়। ব্যক্তির অসাধু প্রবণতা এবং মেধার অক্ষমতা এ ধরণের দুর্নীতির উৎস। বিষয়টি স্পষ্ট হবে দুর্নীতি বিষয়ক নিম্নলিখিত মতামত হতে :

'In some countries, government officials have broad or not well defined power, and the line between what is legal and illegal can be difficult to draw. What constitutes illegal corruption differs depending on the country or jurisdiction. Certain political funding practices that are legal in one place may be illegal in another. -Wikipedia, the free encyclopedia.

দুর্নীতির পরিচয়ের বিশ্লেষণ হতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১। একমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নেয়।

www.bjilibrary.com

২। ভালমন্দ বিচার বোধের সীমাবদ্ধতা বা অক্ষমতা, ব্যক্তিগত অসৎ প্রবণতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার ব্যবহার সংক্রান্ত দ্ব্যর্থবোধকতা দুর্নীতির অন্যতম প্রধান উৎস।

ব্যক্তিগত স্বার্থ বলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় উপায়ে ব্যক্তিগত আর্থিক উপযোগিতা বা ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধিকেই বুঝায়। বহুল ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়গুলোকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায়:

প্রত্যক্ষ উপায়

১। ঘুষ লেনদেন।

২। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ ব্যবসায়িক সুবিধা গ্রহণ।

৩। চাঁদাবাজি করা।

৪। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ করা।

৫। প্রতিকূল পরিবেশ বিবেচনায় অতিরিক্ত মূল্য আদায় করা। ইংরেজীতে একে robbery বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬। অবৈধ সুবিধা বা ব্যবসার অবৈধ মুনাফা অর্জনের প্রেক্ষিতে কমিশন লেনদেন।

পরোক্ষ উপায়

১। Nepotism বা স্বজনপ্রীতি।

২। Cronyism বা ঘনিষ্ঠজনপ্রীতি।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে উপায়েই হোক না কেন দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে আরও নানাবিধ কারণ। তার কিছু তুলে ধরছি। যেমন :

১। সরকারের জবাবদিহিতার বিষয়ে স্বচ্ছতার অভাব এবং সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগে দ্ব্যর্থবোধকতার সুযোগ।

২। বৈধ তথ্যের অবাধ প্রবাহের স্বাধীনতার অভাব।

৩। মিডিয়ার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা প্রদান।

৪। হিসাব পদ্ধতির অপপ্রয়োগ।

৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় 'সময়ের একফোঁড় অসময়ের দশফোঁড়' নীতির অনুসরণ না করা।

৬। বিশেষ করে সরকারী সকল পর্যায়ে দুর্নীতির Whistle blowers-দের নিরাপত্তা প্রদানের অভাব।

৭। Benchmarking এর অভাব।

৮। নিম্নমানের বেতন কাঠামো।

৯। সার্বিকভাবে সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাবে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে। Justice is a hygiene factor of the society –অর্থাৎ শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা যেমন প্রয়োজন

www.bjilibrary.com

তেমনি সমাজের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচার। ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা না গেলে দুর্নীতি সমাজকে অসুস্থ করবেই।

১০। দুর্নীতিগ্রস্ত জনবল দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, লড়াইয়ের নামে প্রহসন করা মাত্র।

দুর্নীতির প্রতিকার

দুর্নীতির প্রতিকারে করণীয় বিষয়ে বিনীতভাবে কিছু কথা রাখতে চাই।

প্রথমত ঃ Code of ethics

যার যা নেই তা সে দিতে পারে না কখনো। চাঁদের নেই সূর্যের প্রখরতা এবং সূর্যের নেই চাঁদের স্নিগ্ধতা। একজন পুরুষ যতই সুপুরুষ হোন না কেন গর্ভধারন করতে পারেন না কখনো।

দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে পৃথিবীর কোনো জীবনব্যবস্থাই সফল হতে পারেনি যেমন পেরেছে ইসলাম। তাই আন্তরিকভাবে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে যাঁরা লড়াইয়ে নেমেছেন তাঁদেরকে অবশ্যই এ বিষয়টা ভেবে দেখতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসলামের code of ethics-কে এড়িয়ে অন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হোক না কেন সাময়িক সফলতা পাওয়া যাবে। মূলোচ্ছেদ হবে না কখনোই। কারণ ইসলাম ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার কোন শক্তি নেই।

ইসলামে অর্থনীতির জন্য, রাজনীতির জন্য, ব্যবসার জন্য, জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্যই রয়েছে - code of ethics। আর এজন্যই Islam is a complete code of life. এসব code of ethics-কে যত্ন করে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত ঃ মানবিক পদ্ধতি

মানব প্রকৃতির মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মদ পানের মজ্জাগত অভ্যাসকে চিরতরে নির্মূল করতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, দুর্নীতি নির্মূলেও সে পদ্ধতির প্রয়োগ করা অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে সব চেয়ে বেশী মানবিক। আর মানুষের জন্য মানবিক পদ্ধতি ব্যবহার করাই সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক। আল্লাহপাক প্রাথমিক পর্যায়ে মদের ভেতর ভালর চেয়ে মন্দের হার অনেক বেশী এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন 'লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক' (সূরা : ২, আল বাকারা ঃ ২১৯ নং আয়াত)।

দুর্নীতির মধ্যেও রয়েছে ভাল দিক বা ব্যক্তি স্বার্থের দিক। কিন্তু খারাপ দিকটি, ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাল দিকের চেয়ে বেশী।সুতরাং দুনীতি সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য । এ বিষয়টি গোটা জাতির নিকট বিভিন্ন সেমিনার, টক শো ইত্যাদির মাধ্যমে তুলে ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয়ভাবে তীব্র ঘৃণাবোধ জাগ্রত করা দরকার।

www.bjilibrary.com

পরবর্তী পর্যায়ে সালাতে মদাসক্ত অবস্থায় দন্ডায়মান হতে আল্লাহপাক নিষেধ করেছেন 'হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার' (সূরা : ৪ আন্ নিসা ঃ ৪৩ নং আয়াত)। ফলে সালাতের প্রতি আন্তরিক হবার কারণে প্রকৃত মুমিনদের মধ্যে মদের প্রতি আসক্তি প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। একইভাবে দুর্নীতি পরায়ণদের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে স্বভাবতঃই তা দুর্নীতির প্রতি আসক্তি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

সবশেষে আল্লাহপাক মদ সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত মতামত জানালেন এভাবে, 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া ... ... শয়তানী কার্য। সুতরাং তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' (সূরা : ৫ আল মায়িদা ঃ ৯০ নং আয়াত)। একইভাবে দুর্নীতি অবশ্যই শয়তানী কার্য। সুতরাং তা বর্জনীয়। আল্লাহপাক বলছেন : 'হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। (সূরা : ২৪ আন্ নূর ঃ ২১ নং আয়াত)। আর একথাতো বলাবাহুল্য যে, দুর্নীতি মন্দ কার্যের অন্যতম।

যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশদাতা শয়তান। 'আর নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' (সূরা : ১২ ইউসুফ ঃ ৫নং আয়াত)। আল্লাহপাক বলেছেন, 'হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করোনা, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (সূরা: ২ আল বাকারা ঃ ১৬৮ নং আয়াত)। আল্লাহপাক আরো বলছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (সূরা : ২ আল বাকারা ঃ ২০৮ নং আয়াত)।

যেহেতু দুর্নীতি একটি মহাপাপ এবং শয়তান কর্তৃক নির্দেশিত মন্দ কার্য সুতরাং তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাজ্য। বস্তুতঃ স্বেচ্ছায় দুর্নীতি পরিত্যাগ করাই যুক্তি, বিবেক এবং ঈমানের দাবী। এরপরও কেউ যদি স্বেচ্ছায় দুর্নীতি পরায়ণ হয় তবে তার উপর আরোপিত শাস্তি ন্যায় সংগতই হয়। কিন্তু উদ্ধৃত আয়াতগুলোর মর্ম বিবেচনা এবং জাতীয়ভাবে আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয়। আমরা কি শয়তানকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করি? মানুষ যখন শয়তানের পদাংক বা শয়তানের নির্দেশ অনুসরণ করতে শুরু করে, মানুষের পাপ শুরু হয় সেখান থেকে। আমরা কি শয়তানের প্ররোচনায় মানুষের উদ্বুদ্ধ না হওয়ার মত পরিবেশ দিতে পেরেছি? আসমান থেকে পাঠানো বাণী- 'যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশদাতা শয়তান' - আমরা কি বিশ্বাস করি? আমাদের জাতীয় জীবনে এই প্রশ্নগুলোর জবাব ইতিবাচক নয়। বর্ণিত বিশ্বাসের প্রতিফলন আমাদের জাতীয় জীবনে নেই বললেই চলে। শয়তানকে শত্রু বিবেচনায় যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কোন জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা আমাদের নেই। ফলে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে, যুগ যুগ ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে

www.bjilibrary.com

সংগ্রাম, কোন সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। শয়তানকে শত্রু বিবেচনায় যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যাতীত এ সংগ্রাম সফল হবার নয়। বিশ্বের কোনো পরাশক্তিও সফল হতে পারেনি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ড পরিশেষে আস্ফালনে পরিণত হয়।

তৃতীয়ত ঃ জাতীয় কমিটি

দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলেন এমন আলেম, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও পেশাজীবি সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সংস্থার একটি 'গবেষণা ও উন্নয়ন বা 'Research and Development' সেল থাকা প্রয়োজন।

জাতীয় কমিটি উক্ত 'গবেষণা ও উন্নয়ণ বা 'Research and Development' সেলে কাজ করবেন। প্রথমতঃ সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোয় ইসলামের code of ethics এর আলোকে বর্তমানে প্রচলিত বিধি নতুন করে কিভাবে ঢেলে সাজানো যায়, দ্বিতীয়তঃ 'ক্ষমতা ব্যবহার সংক্রান্ত' বিধি সমূহের দ্ব্যর্থবোধকতা কিভাবে দূরীকরণ করা যায়, এছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিভাবে ইসলামের code of ethics-গুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যায় তার একটি কর্মপন্থা বের করার লক্ষ্যে জাতীয় কমিটি নিরলস কাজ করবেন। জাতীয় কমিটি, শয়তানকে শত্রু বিবেচনায় যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

শেষকথা

বর্ণিত জাতীয় কমিটির এই কার্যক্রম এভাবে অব্যাহত থাকলে পর্যায়ক্রমে সারাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত হবে আশা করা যায়। আর দুর্নীতির শয়তানী গ্রাস থেকে দেশ মুক্ত হয়ে এক সমৃদ্ধশালী এবং সফল বাংলাদেশ গড়ে উঠুক এটা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এদেশের সকল মানুষের কাম্য। পরিশেষে গণচীনের নেতা দেং-শিয়াও-পিং এর একটি মূল্যবান বাণী– "বিড়াল সাদা বা কালো সেটা বড় কথা নয়, বিড়াল ইদুর মারে কিনা সেটাই বড় কথা" স্মরণ করিয়ে বলতে চাই, ইসলামের code of ethics এর ব্যাপারে কারো ভালো লাগা না লাগায় কিছু আসে যায় না কারণ দুর্নীতির ইদুর দমনে ইসলামের code of ethics এর কোন বিকল্প নেই।■

লেখক-পরিচিতি : শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির– বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ গাজীপুর-এ ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা ও পরিদর্শন) পদে কর্মরত আছেন।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১লা নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.bjilibrary.com

পুঁজিবাদী শোষণের নানা কৌশল

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

■

আর্জেন্টিনার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দান্তে কাপটু (Dante Cuputo) ১৯৮৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত বিদায়ী সভাপতির ভাষণে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে বলেন, 'পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বর্তমান বিশ্বে আমরা সবাই একই ট্রেনের অভিযাত্রী। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা নিরাপদ হতে পারে না যদি তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে বোমা থাকে।[১] বিষয়টিকে পরিষ্কার করতে গিয়ে জাতিসংঘের ৪৪তম অধিবেশনের নব নিযুক্ত সভাপতি নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত জোসেফ গারবা (Joseph Garba) বলেন, 'বিশ্বের বর্তমান অশান্তি ও অস্থিরতার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের সুচতুর কৌশল।[২] বিশ্বের এক অংশের (দক্ষিণের অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের) ১২০ কোটি মানুষ আজ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানের ফলে ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, গৃহহীনতা ও রোগে ভুগছে।[৩] আর অপর অংশের (উত্তরের অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশসমূহের) জনগণ যা বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর এক দশমাংশ[৪] চরম ভোগ বিলাসে অপচয় করছে সম্পদ। এখন থেকে দু'দশক আগে জার্মানীতে অনুষ্ঠিত পদার্থবিদদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মার্কিন প্রফেসর ভিকটর সিডেল (Victor Sidel) তদানীন্তন বিশ্বের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন এভাবে, বর্তমান বিশ্বে প্রতিদিন শুধু অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে ৪০,০০০ শিশু, অথচ বিশ্বে প্রতিদিন যে খাদ্য উৎপাদিত হয় তা বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদারও দ্বিগুণ।[৫] অপরদিকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী

www.bjilibrary.com

শোষকরা সম্পদের অপব্যয় করছে সামরিক গবেষণা ও নতুন নতুন মানব বিধ্বংসী সময়াস্ত্র নির্মাণে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব প্যারেজ দ্যা কুয়েলার (Perez de Cueler) এর হিসেব মতে, প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার তিনশত কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে শুধু যুদ্ধাস্ত্রের পেছনে।[৬] কিন্তু এভাবে ব্যয়কৃত মাত্র ২০ দিনের অস্ত্র খরচ দিয়ে পৃথিবীর সকল শিশুর সারা বছরের খাবার, পানীয় এবং জীবন রক্ষাকারী প্রতিষেধকের প্রয়োজন মেটান সম্ভব হতো।[৭] বিশ্ব বাজারে অর্থনৈতিক মন্দা এবং দেশে দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশসমূহের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা মানব জীবন ও সভ্যতাকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে।

বিগত দু'তিন শতাব্দী থেকে বিশ্ববাসী এক বীভৎস অর্থনৈতিক দুষ্টচক্রে (Vicious Circle) ঘুরপাক খেয়ে চলছে। এখন এ দুষ্টচক্র মানবতা বিধ্বংসী এক ভয়াল আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির খোলসে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ মানবতাকে তার উদরে গ্রাস করে চলেছে। এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন দৈত্য-দানব, কুমীর-হাঙ্গর, চিতা-ভল্লুক আর জোঁক-সাপের মত। শত কোটি বনি আদম, হাজার মানব সমাজ আর অসংখ্য রাষ্ট্রকে নানা কৌশলে তার করাল গ্রাসে পরিণত করেছে। পৃথিবীর প্রধান পুঁজিবাদী শক্তি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর অসংখ্য দেশের শাসকগোষ্ঠী আজ এই মার্কিনীদের হাতের পুতুল। এখন মানবতার জন্য এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া পাহাড় টলানোর মতই দু:সাধ্য মনে হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনীতি দার্শনিকগণ কেউ আত্মজালে আবদ্ধ। কেউবা তত্ত্বজালে, কেউ গোত্র জালে, কেউবা শ্রেণী স্বার্থে করে নিয়েছেন সন্ধি। এজন্যই পুঁজিবাদের যুলুম শোষণ ও আগ্রাসনের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে মানবতা। এ থেকে মুক্তি পেতেই হবে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষের শোষণ ও নিপীড়ন মানব কল্যাণের পরিপন্থী।

বিগত প্রায় ৬০০ বছর যাবৎ দাপটের সাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান রয়েছে। এ অর্থব্যবস্থা মূলত ব্যবসায়ীদের কর্মকা কে কেন্দ্র করে পুঁজির প্রবাহ ও বাজার ব্যবস্থার সমন্বয়ে সৃষ্ট। ধাপে ধাপে বিবর্তিত ও নতুনত্ব লাভ করে পুঁজিবাদ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, বাজার অর্থনীতি, মুক্তবাজার অর্থনীতি, উদার অর্থনীতি, অবাধ বাজার অর্থনীতি, বিশ্ব পুঁজিবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

যে অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে তাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বলে। পুঁজিবাদ বলতে এমন এক ব্যবস্থাকে বুঝায় যেটি সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা, সাধারণ পন্য উৎপাদন ব্যবস্থা ও মুনাফাভিত্তিক অর্থনৈতিক তৎপরতা, সংখ্যাগুরু মানুষের সম্পত্তিহীনে রূপান্তর ও ক্রমে শ্রমিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং সম্পর্কিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তৎপরতা দ্বারাই চিহ্নিত হয়। বর্তমানে পুঁজিবাদ

www.bjilibrary.com

বলতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক তৎপরতাই বুঝায় না সেই সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শ্রেণীবিন্যাস, ক্ষমতার সম্পর্ক ইত্যাদি উঠে আসে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর নির্ভরশীল। এমন অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তির অধিকারে থাকে। ফলে পুঁজিবাদী সমাজে যে কোন ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় ও নিজের পরিচালনায় শিল্প কারখানা স্থাপন করে ব্যবসায় চালাতে পারে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এ অর্থনীতিতে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান থাকে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সকল উৎপাদনকারী উৎপাদন করে এবং সকল ভোক্তা উপযোগ সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা করে।

পুঁজিবাদের মূলনীতি

যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে তা ৮টি এবং সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. ব্যক্তিস্বার্থ (Self Interest),
২. ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ (Private Property and enterprise),
৩. লাভের আকাঙ্ক্ষা (The Profit Motive),
৪. বাজার ব্যবস্থাপনা (Market Mechanism),
৫. মুক্ত বাণিজ্য সম্পাদনে সুশীল সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রদান (Civil Society ensuring institutional support for free enterprise),
৬. ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার সংরক্ষণ ও চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করার জন্য একটি আইনগত কাঠামোর বিদ্যমানতা (The availability of a juridico-legal framework for business rights and enforcement of contracts),
৭. টাকার অন্তবর্তিতা বা আন্তঃপ্রবাহ (The intermediation of money),
৮. সুশাসন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যা অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থঃ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (Good governance and political stability providing domestic and external security)।

সম্পদ বা পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন পুঁজিবাদের অনন্য দিক।

পুঁজিবাদের বিবর্তন ধারা

পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়কে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, এর পেছনে অবধারিতভাবেনিহিত আছে ঐ সকল পর্যায়ে বিদ্যমান শিল্পীয় উৎপাদন কৌশল; যা বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চরিত্রটি দান করেছিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারণ করেছিলো ঐ সময়কার প্রচলিত রাজস্ব আয়-ব্যয় পদ্ধতির মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের নীতিমালাকে। নির্ধারণ করেছিলো বাণিজ্যিক চরিত্রকে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক,

www.bjilibrary.com

সাংস্কৃতিক প্রচলিত রীতি পদ্ধতিকে। ড. আবু মাহমুদ পুঁজিবাদের সামগ্রিক ইতিহাসকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন–

১. মার্কেনটাইল ইজম : 'অর্থই একমাত্র সম্পদ' এই মতবাদ ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা মার্কেনটাইল ইজম বা বাণিজ্যবাদ হিসেবে অভিহিত। মার্কেনটাইল অর্থনীতি হস্ত শিল্পের উপর ভর করে গড়ে উঠেছিলো।

২. লিবারেল ইজম : সংস্কারমুক্ত অর্থনীতি বা লিবারেল ইজম তথা লিবারেল অর্থনীতি হাল্কা শিল্পের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো। এর মধ্যে প্রাধান্য ছিলো শিল্প পুঁজির।

৩. ইম্পেরিয়ালিজম : সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি বা ইম্পেরিয়ালিজম তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আবির্ভাব হয় ভারী। লৌহজাত এবং রাসায়নিক শিল্পকে ভিত্তি করেই। পরবর্তী বৈদ্যুতিক শক্তিও তার আওতার মধ্যে ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়।

ড. এম. উমার চাপরা পুঁজিবাদের বিবর্তন ধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে পুঁজিবাদের বিবর্তন ধারা নিম্নরূপ ঃ

- ব্যবসাভিত্তিক পুঁজিবাদ (Merchant Capitalism),
- শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদ (Industrial Capitalism),
- অর্থনৈতিক পুঁজিবাদ (Financial Capitalism),
- কল্যাণকর পুঁজিবাদ (Welfare Capitalism),
- রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (State Capitalism),
- বিশ্ব পুঁজিবাদ (Global Capitalism),

পুঁজিবাদের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে মধ্যযুগীয় ইউরোপে। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলে গোটা ইউরোপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সামন্তবাদী ব্যবস্থা বিকশিত হয়। চিরায়ত পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ধারার (Classical West European Model of Capitalism) ইতিহাসে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী গঠন সামন্তবাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে ভিত্তিমূলে পরিবর্তন আনে। এ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

১. জমির মালিকানাই ছিলো শাসন ক্ষমতার ভিত্তি,

২. গীর্জার উদ্ভব ঃ সামন্তবাদের প্রতি সমর্থন দানের জন্য– খোদার নাম নিয়ে নিজেদের কথা বলা হত গির্জার পক্ষ থেকে,

৩. কেন্দ্রীয় শক্তির অবর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষুদ্র আঙ্গিকে পরিচালিত হত,

৪. শিল্প ও ব্যবসায় গোষ্ঠীবদ্ধতা অন্যরা যাতে এতে প্রবেশ করতে না পারে।

সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারায় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। গীর্জার

www.bjilibrary.com

পুরোহিতদের সাথে যোগসাজসে রাজতন্ত্র হয়ে উঠে চরম শোষণতন্ত্র এবং একই সাথে তা চরম নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়।

এ পর্যায়ে ইউরোপীয় রেঁনেসা সৃষ্টি হয় যার ব্যাপ্তি চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষষ্টদশ শতাব্দী পর্যন্ত। রেঁনেসার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ

১. মুসলিমদের স্পেন জয় এবং কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ক্রুসেডের কারণে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসে ইউরোপীয়রা।

২. প্রেস আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাগরণ সৃষ্টি হয়।

৩. নতুন এলাকা আবিষ্কারের ফলে নতুন বাজার সৃষ্টি হয়, আন্তর্জাতিক ব্যবসার সূত্রপাত হয় ইউরোপে বাণিজ্যবাদ বা মার্কেন্টালিজমের বিকাশ ঘটে। এদের মূল প্রেরণা ছিল বেশি রপ্তানী কর, প্রাপ্য আয় স্বর্ণ রৌপ্য মনি মুক্তায় বুঝে নাও আর গোটা বিশ্বের সম্পদ এনে জড় কর ইউরোপে।

৪. উন্নয়নে বুর্জোয়া শ্রেণী তথা সওদাগর, মহাজন, সামুদ্রিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের আবির্ভাব ঘটে।

৫. গীর্জা ও সামন্তবাদীদের সাথে সংঘাত- ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বিজয়।

৬. একাদশ শতাব্দীর ক্ষুদ্র জায়গীরের বিলুপ্তি- জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম।

৭. জাতীয় রাষ্ট্রের গীর্জা বিরোধী ভূমিকা - এ ভূমিকা ধীরে ধীরে তৈরী হয়।

৮. লিবারেলিজমের জন্ম - ধর্মের বিরুদ্ধে।

মধ্যযুগের লিবারেলিজম

এ পর্যায়ে :

১. ধর্মের বিরুদ্ধে উদারতার বিজয় হয়েছে বলে দাবী করা হয়।

২. সুদকে নিশ্চিত পাপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়– সকল ধর্মগ্রন্থই সুদকে অবৈধ মনে করে।

শিল্প বিপ্লব

শিল্প বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদ আরও উচ্চকিত ও প্রবল হয়। এ সময়েই ১৭৭৬ সালে রচিত হয় পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির কালজয়ী গ্রন্থ সুবিখ্যাত ইংরেজ পন্ডিত এ্যাডাম স্মিথ (১৭২০-৯০), বিরচিত An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. এর বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও কারণসমূহ অনুসন্ধান'। এ গ্রন্থের মূলতত্ত্ব ছিলো মূল্য ব্যবস্থার অদৃশ্য হস্ত চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেশিনারীজ আবিষ্কার বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে। শিল্প বিপ্লবের ফলে উপনিবেশবাদ আরও জেঁকে বসে।

www.bjilibrary.com

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উদ্ভাবন ও শিল্প উৎপাদনের কলাকৌশলকে ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে ব্যাপক ও নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এরই ফল হচ্ছে শিল্প বিপ্লব। এর ফলে বিকশিত হয় ভোগবাদী দর্শন। 'খাও দাও ফূর্তি করো' এ মন্ত্রে জনগণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

আধুনিক লিবারেলিজম

১. রাজনীতিতে ধর্মহীনতা।

২. সভ্যতা সমাজ সাহিত্যে নিরংকুশ ব্যক্তি স্বাধীনতা।

৩. অর্থনীতিতে অবাধ উন্মুক্ত নীতি।

৪. অসীম উদারতা।

৫. আধুনিক পুঁজিবাদ ও নবতর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক পুঁজিবাদ

পুঁজি কর্মকুশলতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতার সমন্বয়ে অবাধ উদার অর্থনীতির জন্ম। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

১. অবাধ ব্যক্তি মালিকানা- ব্যক্তি মালিকানার প্রাধান্য, ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা,

২. উপার্জন অধিকারের স্বাধীনতা,

৩. ব্যক্তিগত মুনাফাই কর্ম প্রেরণার উৎস/মুনাফার অভিপ্রায় (Profit Motives),

৪. বাজারের মাধ্যমে মৌলিক ৩টি সমস্যার সমাধান করা হয়,

৫. ভোক্তা সার্বভৌম (Sovereign)। ভোক্তা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পছন্দ প্রয়োগ করতে পারেন,

৬. যে সব পণ্য উৎপাদন করলে বেশী মুনাফা হবে প্রতিষ্ঠানসমূহ সেসব পণ্যই উৎপাদন করে,

৭. প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা,

৮. মালিক ও মজুরের অধিকারের পার্থক্য,

৯. বল্গাহীন ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান unfettered private enterprise,

১০. শ্রম ও মালিকানার ভিত্তিতে মজুরী ও সম্পদ আয় সৃষ্টি করা,

১১. ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ঠিক করেন তিনি কিভাবে আয় ব্যবহার করে ভোগ করবেন,

১২. প্রযুক্তির ব্যবহার,

১৩. রাষ্ট্র সরকারের নিষ্ক্রিয়তা, সরকার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কখনই হস্তক্ষেপ করে না,

১৪. উন্মুক্ত অবাধ অর্থনীতি,

১৫. বাজার ব্যবস্থার নীতি Mechanism of the market.

www.bjilibrary.com

পুঁজিবাদ তার দাপট ও শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করেই চলেছে। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ বা ব্যবসাভিত্তিক পুঁজিবাদ দিয়ে তার যাত্রা শুরু। ক্রমে শিল্প পুঁজি, অর্থনৈতিক পুঁজি, বিনিয়োগ পুঁজি ইত্যাকার পর্যায় অতিক্রম করে সে পৌঁছেছে বহুজাতিক পুঁজির বিশাল অংগনে। এ বাজার পুঁজিবাদেরই তৈরী। বিশ্ববাসীকে শোষণের লক্ষ্যে এ তারই উদ্ভাবিত কৌশল। এর অপ্রতিহত গতি ও সাফল্যকে ধরে রাখতে এর উদ্ভাবিত বর্তমান কৌশল হলো বিশ্বায়ন (Globalization) বা বিশ্ব পুঁজিবাদ (Global Capitalism)। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। পুঁজিবাদ এখন অর্থ ও ডলারের ডিক্টেটরশীপে পরিণত হয়েছে।

পুঁজিবাদের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ড. এম. উমর চাপরা পুঁজিবাদের ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে :

১. ব্যক্তি মানুষের পছন্দের ভিত্তিতে সর্বাধিক পণ্য ও সম্পদ উৎপাদন এবং চাহিদা পূরণকে পুঁজিবাদ মানব কল্যাণের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। It considers accelerated wealth expansion and maximum production and want satisfaction in accordance with individual preferences to be of primary importance in human wellbeing).

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যক্তিমালিকানা অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণে অবারিত স্বাধীনতাকে পুঁজিবাদ অপরিহার্য মনে করে (It deems unhindered individual freedom to pursue pecuniary self Interest and to won and manage private property to be necessary for individual initiative).

৩. অর্থনৈতিক সম্পদ বণ্টনে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদক শ্রেণী কর্তৃক বিকেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে পুঁজিবাদ অত্যাবশ্যক মনে করে (It assumes individual initiative along with decentralized decision making in freely operating competitive markets to be sufficient conditions for realising optimum efficiency in the attraction of resources).

৪. উৎপাদন দক্ষতা বা বণ্টনমূলক সমতা অর্জন, কোন ক্ষেত্রেই সরকারের বৃহৎ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে বলে পুঁজিবাদ মনে করে না (It does not recognise the necessity of a significant role for government or collective value judgements in either allocative efficiency or distributive equity)

৫. পুঁজিবাদ দাবী করে যে, মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক

www.bjilibrary.com

স্বার্থও পূরণ হবে (It claims that serving of self interest by all individuals will also automatically serve the collective social interest).

পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা

ক্লাসিকাল লেইজে ফেয়ার (Classical Laissez faire) পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীর কোথাও নেই। পুঁজিবাদের খারাপ দিকগুলো হচ্ছে :

১. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বেকারত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে।

২. দ্রুত উন্নয়ন ও বিপুল সমৃদ্ধি সত্ত্বেও দক্ষতা ও সমতার স্বপ্ন সোনার হরিণই রয়ে যায়।

৩. নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তিস্বার্থ সমাজ স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে।

সমাজের চাহিদা পূরণে পুঁজিবাদের ব্যর্থতা

ড. এম. উমর চাপরা সমাজের চাহিদা পূরণে পুঁজিবাদের ব্যর্থতাকে ৩টি পয়েন্টে আলোচনা করেছেন। যেমন :

১. **পুঁজিবাদের উদ্দেশ্য ও কৌশলের সাথে সমাজের লক্ষ্য ও চাহিদার সংঘাত (the conflict between the goals of society and the worldview and strategy of Capitalism) :** ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজ স্বার্থের মাঝে বিরোধিতার বদলে সেতুবন্ধন রচিত হবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দাবী করেছে। কিন্তু যেসব ধারণা, পূর্বশর্ত ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এ দাবী করা হয়েছে তা অবাস্তব ও অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২. **পূর্ণাঙ্গ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ঃ** সমাজের চাহিদা ও লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। পুঁজিবাদ সামাজিক ডারউইনবাদ বাস্তবায়নের একপ্রকার অমানবিক প্রচেষ্টার নামান্তর।

৩. **শর্ত ও ধারণার সুস্পষ্ট বিবরণের অনুপস্থিতি ঃ** পুঁজিবাদের ভিত্তিভূমি হিসেবে যেসব শর্ত ও ধারণার কথা বলা হয় তার সুস্পষ্ট কোন বিবরণ পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ উপস্থাপন করেননি বিধায়, এসব অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারণার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক দক্ষতা ও 'সমতা' অর্জিত হবে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

পুঁজিবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনের রূপই প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী।

পুঁজিবাদের ইতিবাচক দিক

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সম্পদের বিপুল সম্প্রসারণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিকাশ ও উন্নয়ন, অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীলতা ও সৃজনশীলতার জোয়ার সৃষ্টি করে নতুন নতুন

www.bjilibrary.com

উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের দ্বারা মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। পুঁজিবাদই এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

পুঁজিবাদের নেতিবাচক দিক

পুঁজিবাদের ক্ষতিকারক দিকগুলো জর্জরিত করেছে পৃথিবীর অধিকাংশ বনি আদমকে। ভাবিয়ে তুলছে চিন্তাশীল মানুষকে বার বার। তবুও ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সম্পদের দাপটে টিকে আছে এর বিশাল দানবীয় রূপ।

উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ ও অধিক মুনাফা অর্জন প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় মানবীয় দিক বলে আর কিছুই থাকে না এ মতবাদের। মুনাফা অর্জনের জন্য এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সবই বৈধ-এটি মূলত পুঁজিবাদের প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। অদ্যাবধি তা কার্যতঃ ব্যবসায়ীদের হাতেই আছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার শীর্ষ পদে আরোহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সমর্থন ও সহযোগিতাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোও ক্ষমতার শীর্ষে ব্যবসায়ী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের সমর্থনপুষ্ট দালালদের আরোহণ নির্বিকারে অবলোকন করছে।

সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও পুঁজিবাদে সম্পদের সুষ্ঠ ও সুষম বণ্টন কখনোই হয় না বিধায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সমভাবে বৃদ্ধি পায় না। ফলতঃ ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তি স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়াতে দায়বদ্ধতাহীন প্রাণীতে পরিণত হয়। ভোগ বিলাস, সম্পদ করায়ত্তকরণ ও সঞ্চয়ের সর্বব্যাপী মানসিকতার প্রভাবে বিলুপ্ত হয় সামাজিক আদান-প্রদান, সহযোগিতামূলক মনোভাব। এভাবে ব্যক্তি ও সমাজ সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কবিহীন দুটি পৃথক সত্তায় পর্যবসিত হয়। এ জন্যই শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার, যুলুম ও দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত অসহায় মানুষেরা। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রাচুর্যের পাশাপাশি ব্যাপক দারিদ্র্য, অপচয়, অপব্যয়ের সাথে সাথে ক্ষুধা এবং ভোগ বিলাসের পাশাপাশি ব্যাপক বঞ্চনার চিত্র বিরাজমান। পৃথিবীর ২০% পুঁজিবাদী বিত্তশালীর জিডিপি বিশ্ব জিডিপির ৮৭%, যা সুস্পষ্টভাবে ভারসাম্যহীন, অযৌক্তিক ও অবিচারমূলক অর্থনীতির চিত্র ফুটিয়ে তোলে।

পুঁজিবাদের পরীক্ষা-নীরিক্ষা পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে শেয়ার বাজারে ধস, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্যর্থতা পুঁজিবাদের সাফল্যের মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের হাতে জিডিপির মাত্র ১০% থাকার পরিস্থিতি। এর পেছনে পুঁজিবাদ সৃষ্ট ভোগবাদী মানসিকতা, অবিচার, সম্পদের অসম বণ্টন দায়ী। পুঁজিবাদের পুরো প্রক্রিয়াটি

www.bjilibrary.com

শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিচালিত হয়ে আজ বিশ্বায়নের কৌশলে পুষ্ট গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের রূপ পরিগ্রহ করছে। পুঁজিবাদকে আধুনিক বিশ্ব মেনে নিচ্ছে না, মেনে নিতে পারে না। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিশ্বের মূল ঘাঁটিতেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে। এই বিক্ষোভের একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র আছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের দু:খের মূল কারণ যা না হলেও চলে তাকেই অপরিহার্য মনে করা। লোভী মানুষ নিত্য নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি করেই চলেছে। ফলে বাড়ছে মানুষের দারিদ্র্য আর যন্ত্রণা।

এইচ.জি. ওয়েলস (H.G. Wells) বলেছেন, 'যদিও আমরা কেউ পুঁজিবাদের সঠিক সংজ্ঞা জানি না, তবু পুঁজিবাদ বলতে আমরা সাধারণত কিছু কঠিন ঐতিহাসিক শব্দ, অনিয়ন্ত্রিত অর্থোপার্জনের মানসিকতা, শোষণের বহুবিধ কৌশল এবং জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে হলেও বিকৃত সুযোগ সন্ধানকে বুঝে থাকি।'

পুঁজিবাদী শোষণের কৌশলসমূহ

পৃথিবীর উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহসহ বিভিন্ন কায়দায় সম্পদ লুণ্ঠন করে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করেছে, শিল্পোন্নত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে শিল্পজাত দ্রব্য তৃতীয় বিশ্বে অসম বাণিজ্যের মাধ্যর রপ্তানী করে নতুনতর শোষণ প্রক্রিয়া চালু করেছে। গতানুগতিক অর্থে ঔপনিবেশিক যুগ অনেকাংশ অবক্ষয়িত হলেও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ নিত্য নতুন কায়দায় তৃতীয় বিশ্ব তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ আজও অব্যাহত রেখেছে। বলা যায় চন্দ্রবেশী নয়া উপনিবেশবাদের উদ্ভব হয়েছে । পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের প্রাক্তন উপনিবেশকে পদানত করে রাখার জন্য নয়া কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। এসব কৌশলের চরিত্র যথেষ্ট সূক্ষ্ম এবং এর মন্দ দিকগুলো আপাত দৃষ্টিগোচর নয়। কিন্তু এসব লুকানো কৌশলের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মূল মর্মবস্তু ঠিকই অটুট থাকে। এসব কৌশলের মধ্যে পড়ে প্রাক্তন উপনিবেশের কৃষি-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনের বিরোধিতা করা এবং এইভাবে খাদ্যের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী পরনির্ভরতা সৃষ্টি, অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তর, শর্তযুক্ত সাহায্য প্রদান ও চিরস্থায়ী পরনির্ভরতা সৃষ্টি, বহুজাতিক কোম্পানীর পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের শোষণ, স্থানীয় একচেটিয়ার সঙ্গে অজ্ঞাত, মুৎসুদ্দী শ্রেণী সামন্তচক্র- একচেটিয়া শিল্পপতিদের স্বার্থের ধারক-বাহকদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়– নব্য উপনিবেশবাদের উদ্ভবের ফলে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তার নির্লজ্জ উলঙ্গ প্রত্যক্ষ রূপের পরিবর্তে গোপন, পরোক্ষ ও মিশ্র রূপ ধারণ করেছে। এ শোষণ কৌশলের ফলশ্রুতিতে অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশগুলো। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলে ক্রমশঃ বেশি করে আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে ও দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

পুঁজিবাদী শোষণের কৌশলসমূহ নিম্নরূপ

১. বিশ্ব সংস্থাসমূহের মাধ্যমে শোষণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তির প্রয়োজনে গড়ে তোলা হয় জাতিসংঘ। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ শোষণের উদ্দেশ্যে এক সময় এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের বহু দেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের সাম্রাজ্যের সেই সীমাহীন প্রাসাদ ভাঙ্গতে শুরু করে। এশিয়া ও অফ্রিকায় সৃষ্ট ব্যাপক জন জাগরণ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে জাতিসংঘের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদিও দৃশ্যতঃ মহৎ ছিল কিন্তু অচিরেই এ বিশ্ব সংস্থার মোড়ল পুঁজিবাদী দেশসমূহ যখন দেখল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তাদের সাবেক উপনিবেশগুলোকে শোষণ করতে না পারায় তারা চরম লোকসানের শিকার হচ্ছে, তখন পরোক্ষভাবে দেশগুলোকে শোষণের হাতিয়ার খুঁজতে লাগলো। তাদের এই অসৎ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক পুঁজির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান– বিশ্ব ব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (IDA), ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন (IFC), গ্যাট (GATT) (যা বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নামে পরিচিত), এডিবি ইত্যাদি। এছাড়াও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত অভিজাত ও যশস্বী সংস্থা– ILO, FAO, UNIDO, UNESCO ইত্যাদির মাধ্যমেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে নিবিড় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এসব নানা ধরনের নানা রং-এ প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে তারা তৃতীয় বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর ঋণ এবং সুদের কঠিন শর্তের জাল বহু দেশকে নিঃশেষ করেছে। ঋণের সুদ প্রদানে ব্যর্থ হয়ে ব্রাজিলের জনগণকে মূল্য দিতে হচ্ছে। মিশর তার নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত গম উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে অর্থ নেয়ার সময় এ শর্তকে হজম করতে হয়েছে যে, মিশর নিজ দেশে গম উৎপাদন করতে পারবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করতে হবে। ফলে খাদ্যের জন্য মিশর এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল।

যে নীতি নিয়ে যে লক্ষ্যে আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বর্তমানে সে অবস্থান থেকে আইএমএফ সরে দাঁড়িয়েছে। আই এমএফ যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটাই এখন প্রশ্ন সাপেক্ষ। তারা এখন ঋণ বিষয়ক কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আইএমএফ এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এক প্রকার প্রতিবন্ধকতার নাম। বিশেষ করে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল যেসব দেশ নিজস্ব আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে নিজস্ব সম্পদ কর্ষণের মাধ্যমে উন্নয়নের পথে এগোতে চায়, তাদের জন্য আইএমএফ সহায়ক নয় বরং পরোক্ষে প্রতিবন্ধক হিসেবেই কাজ করছে। আইএমএফ-

www.bjilibrary.com

এর কথিত সহায়তা কোন দেশকে সত্যিকার উন্নয়নের পথে এগিয়ে দিয়েছে, এমন নজির প্রকৃতপক্ষে নেই বললেই চলে। এই বাস্তবতা এখন তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই বেশ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে। আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক কখনো স্বল্পোন্নত উন্নয়নগামী উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেয় না। আর এ কারণেই দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে কখনো তারা বিবেচনায় নেয় না। তারা তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধনে তাদের নিজস্ব প্রেসক্রিপশন প্রয়োগ করার উপরই সার্বিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আইএমএফ বা বিশ্ব ব্যাংক বা এডিবি স্বল্পোন্নত-উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতি নিয়ে ভাববে এবং সে অনুযায়ী পরামর্শ দেবে, এটা মনে করার বাস্তব কোন কারণও নেই। এই সংস্থাগুলোর মূল উদ্দেশ্য এসব দেশকে ভাল ঋণ পরিশোধকারী দেশে পরিণত করা। দ্বিতীয়ত, এসব দেশকে বহুজাতিক কোম্পানীগুলির স্থায়ী বাজারে পরিণত করে রাখা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ে আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসক্রিপশন মেনে চলতে গিয়ে ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, আর্জেন্টিনা, তুরস্ক, মিশর, ইকুয়েডর, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশকে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়তে হয়েছিল। আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংক তাদের প্রভাবাধীন দেশগুলোতে জনস্বার্থে যেসব ভর্তুকি প্রচলিত সেসব তুলে দিতে এবং নানা কর-ট্যাক্স আরোপ করে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য বরাবর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। সেই সাথে দাতা দেশ ও সংস্থার ঋণ সুদসহ পরিশোধ এবং বহুজাতিক কোম্পানী বাণিজ্য নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে চাপের মুখে।

আইএমএফ এক নতুন ফাঁদ তৈরী করেছে। এ ফাঁদের নাম পলিসি সাপোর্ট ইনস্ট্রুমেন্ট সংক্ষেপে (পিএসআই)। যেসব দেশ আইএমএফ এর ঋণ নিতে অনাগ্রহী কিংবা যাদের ঋণের প্রয়োজন নেই তাদের জন্য এই পিএসআই। এখানে উল্লেখ্য যে আইএমএফের অন্যায় শর্ত ও খবরদারি বরদাশত করতে না পেরে অনেক দেশ তার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণে অনীহা প্রদর্শন করছে। বেশ কিছু দেশ সাফ বলে দিয়েছে, আইএমএফ এর ঋণ তাদের দরকার নেই। এই প্রেক্ষাপটে এসব দেশের ওপর ভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে আইএমএফ পিএসআই চুক্তি প্রবর্তন করেছে। এ চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিকের একটি হলো, পলিসি সাপোর্টের নামে চুক্তিস্বাক্ষরকারী দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে নিয়ামক ক্ষমতা অর্জন করা। অন্যটি হলো অপরাপর দাতা সংস্থা ও দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। এক কথায় পিএসআই হলো, চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশের অর্থনৈতিক নীতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারী ও ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী চুক্তি। এ চুক্তিতে যে দেশ আবদ্ধ হবে সে দেশের অর্থনৈতিক নীতি আইএমএফের নির্দেশনা অনুযায়ী হবে এবং সেদেশের ঋণ প্রাপ্তি এর বোর্ডের অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে। বোর্ড অনুমোদন দিলে ঋণ মিলবে, না দিলে নয়। আইএমএফের ঋণ চুক্তির চেয়েও পিএসআই চুক্তি ভয়ংকর।

পিএসআই চুক্তি নিয়ে বিশ্ব জুড়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। দরিদ্র, স্বল্পোন্নত, উন্নয়নগামী দেশগুলোর অর্থনীতির ওপর নিরংকুশ আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে প্রণীত এ চুক্তিতে

www.bjilibrary.com

আবদ্ধ হতে খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি। আইএমএফের নিরন্তর চাপের মুখে এ পর্যন্ত কেবল আফ্রিকার ৪টি দেশ- কেপভার্দে, উগান্ডা, তানজানিয়া ও নাইজেরিয়া পিএসআই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চারটি দেশ যে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই আত্মঘাতী চুক্তিজালে আবদ্ধ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাফল্যের সম্ভাবনা ও হার হতাশাব্যঞ্জক হলেও আইএমএফ চেষ্টা ছাড়েনি। বিভিন্ন দেশের ওপর আরো অধিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে তারাও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

২০০৭ সালের মে মাসে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ মাসের শেষের দিকে ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট রাফেল কোরেয়া বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। ২০০৫ সালের পূর্বে অনুমোদিত ১০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ আটকে দিয়ে সরকারের পছন্দমত সামাজিক উন্নয়ন খাতে ব্যবহারের পরিবর্তে সে অর্থে ঋণ পরিশোধে ইকুয়েডরের সরকারকে বাধ্য করতে চেয়েছিল। আইএমএফ-এর বিরুদ্ধে ভেনিজুয়েলার অভিযোগ আরো গুরুতর। ১২ এপ্রিল ২০০২ সালে ভেনিজুয়েলার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে আইএমএফ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, নতুন প্রশাসন যেভাবে সুবিধাজনক মনে করে, সেভাবেই তাকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত আইএমএফ। আইএমএফের ফান্ড আসে যে ওয়াশিংটন থেকে সেই মার্কিন সরকারের দলিল পত্রেই লেখা আছে যে, এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে তারা আগেই জানতো এবং তারা এটাকে সমর্থন দিয়েছে ও অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছে এর কোন কোন নেতাকে। জুন ২০০৭ সালে আইএমএফ-এর ইনডিপেনডেন্ট ইভালুয়েশন অফিস থেকে বলা হয়েছে, ১৯৯৯ সাল থেকে আফ্রিকার সাব-সাহারান দরিদ্র দেশগুলোতে প্রদত্ত সাহায্যের তিন-চতুর্থাংশ সাহায্যই মূল লক্ষ্যে ব্যয় করা হয়নি বরং আইএমএফ-এর অনুরোধে ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা হয়েছে। এ এক ভয়াবহ শোষণমূলক কা । এসব দরিদ্র দেশে এইচআইভি এইডস প্রতিরোধের মতো কাজে অর্থ ব্যবহৃত হওয়া ছিল অপরিহার্য।

আইএইএফ ও বিশ্বব্যাংকের জোয়াল থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভেনিজুয়েলা এক অনুকরণীয় নজির স্থাপন করেছে। প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বুকের ওপর থেকে একটি পাথর সরিয়ে দেয়ার পথ দেখিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ভেনিজুয়েলা নির্ধারিত সময়ের ৫ বছর আগেই বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ-এর ঋণ পরিশোধ করে ৮ মিলিয়ন ডলার বাঁচিয়েছে। ১৯৯৯ সালে শ্যাভেজ ক্ষমতাসীন হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে আইএমএফ-এর সব ঋণ পরিশোধ করে দেন। ২০০৬ সালে আইএমএফ ভেনিজুয়েলা থেকে তার অফিস গুটিয়ে নিয়েছে। শ্যাভেজ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর জন্য নতুন ঋণদানকারী ব্যাংক স্থাপনের কথা বলেছেন। ব্যাংক অব সাউথ নামের এ ব্যাংকের মূলধন যোগান দেবে অন্যদের সঙ্গে তেল রফতানিকারক

www.bjilibrary.com

দেশ ভেনিজুয়েলা। ইতিমধ্যে বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, কিউবা ও হাইতির নেতাদের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়ে কথা বলেছেন শ্যাভেজ। ইকুয়েডর এবং আর্জেন্টিনাও বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর ঋণ শোধ করে দিয়েছে। গত ২০০৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর ব্রাজিল আইএমএফ-এর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেছে এবং পুরনো কোন চুক্তি নবায়ন করেনি অথবা নতুন চুক্তিতেও সই করেনি। তারপর সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, সার্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, উরুগুয়ে, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ।

২. বহুজাতিক কোম্পানীর (Multinational companies) মাধ্যমে শোষণ

পুঁজিবাদী নয়া উপনিবেশবাদের শোষণ কৌশল বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্ম থেকে ধরা পড়ে। বহুজাতিক কোম্পানীর পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের শোষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বর্তমানে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রধান বাজারে পরিণত হয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত উন্নয়নগামী-উন্নয়নশীল দেশগুলো। এসব দেশে অস্ত্র থেকে শুরু করে বেবীফুড পর্যন্ত অবাধে উচ্চ মুনাফায় রফতানী করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলো। দুনিয়াজোড়া শোষণের থাবা প্রসারিত করার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিকেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করছে।

বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের কার্যক্রম এবং পুঁজিবাদী দেশসমূহের ভূমিকা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এই বহুজাতিক কোম্পানীগুলিই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক শক্তি। আবার এই রাষ্ট্রগুলো বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি।

গত কয়েক দশকে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। এ বিকাশ ও বিস্তার তাদের অধিকতর মুনাফা, নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ নিশ্চিত করেছে।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ঢুকে চলে বলে কৌশলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এসব দেশে শ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। শ্রমের জন্য, সমাজের জন্য, পরিবেশ দুষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে খরচ হয় তা উন্নত বিশ্বের চাইতে অনেক কম। তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে কর অনেক কম। অথচ এখানে মুনাফার হারটি অত্যন্ত বেশি। তদুপরি পুঁজিবাদী বিশ্ব থেকে আগত পুঁজি বিনিয়োগকরীরা অনুন্নত দেশের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীকে অত্যন্ত দুর্বল, লোভী ও পরনির্ভরশীল মনে করে। এসব দেশের অমলাদের অর্থ, ডিগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে বশ করা যায়। তাই তারা এসব দেশের সরকারগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না। নানা ছল চাতুরী ও প্রতারণা মূলক কলাকৌশল অবলম্বন করে বহুজাতিক কোম্পানীগুলি একটি অনুন্নত দেশের ব্রাঞ্চের উদ্বৃত্ত অন্য অনুন্নত দেশের ব্রাঞ্চে পাচার করে। এইভাবে তৃতীয় বিশ্বের দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে একই বহুজাতিক কোম্পানী Intra Firni pricing

www.bjilibrary.com

arrangement এর মাধ্যমে স্থানীয় করের বোঝা কমাতে পারে। শুধু তাই নয়, এরা অনুগত সরকারগুলিকে হাজার হাজার একর জমি ইজারা (লীজ) দিতে বাধ্য করে। তারা দেশীয় শাসকদের চাপ সৃষ্টি করে ভালো ভালো জমিগুলি হয় মারধর কিনে নিচ্ছে নতুবা দীর্ঘমেয়াদী লীজ নিচ্ছে ফলে জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব বাজারে রপ্তানী প্রক্রিয়াটি বহুজাতিক কোম্পানীগুলির হাতে ঢলে পরার দরুন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আভ্যন্তরীণ উদ্বৃত্তটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলির ব্যবসার দরুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানীগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে। দেশীয় পণ্যের বাজার ক্রমান্বয়েই সংকুচিত হচ্ছে।

মোটকথা সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক রাজত্বটি বহুজাতিক কর্পোরেশনের মাধ্যমে অতিদ্রুত বেগে বিকাশ লাভ করছে।

গত কয়েক দশকে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কি ব্যাপক ও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ

এক. জাতিসংঘের এক সমীক্ষানুযায়ী ১৯৩৮ সালে বিশ্বের বৃহৎ নয়টি তেল কোম্পানী ৪০টি দেশে অপরিশোধিত তেল উত্তোলন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। ১৯৬৭ সাল নাগাদ ৯৬টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে যা ২০০৬ সালে ১৯০টি দেশে বিস্তৃত হয়। ইতোমধ্যে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর উৎপাদিত তেলের সাবসিডিয়ারী পণ্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫১ থেকে ১৪৪২।

দুই. যেসব দেশে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে রাখে সেসব দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসব কোম্পানীকে বিভিন্ন সুবিধা ও নিশ্চয়তা দিতে হয়। কোন জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারও যদি এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে তবে বহুজাতিক কোম্পানী গুলির স্বপক্ষে রাজনৈতিক পাটপরিবর্তন ঘটতেও দেরী হয় না।

তিন. বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থের পরিপন্থী কোন দলের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও এরা ছলে বলে কৌশলে তা ঠেকানোর চেষ্টা করে। এজন্য প্রয়োজন হলে এরা সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিতে টেনে আনে। তুরস্কে ১৯৭৯ সালে সামরিক ক্যুদেতায় এবং ১৯৯০ সালে আলজেরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপে ঐদেশে অবস্থানরত বহুজাতিক কোম্পানীর ভূমিকা ছিল। আর এর মূল লক্ষ্য ছিল তুরস্কে মিল্লি সালামত পার্টির অগ্রগতি রোধ করা এবং আলজিরিয়ায় ইসলামিক স্যালাভশন ফ্রন্টকে নিশ্চিত ক্ষমতা লাভ থেকে হটিয়ে দেয়া।

চার. বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষায় পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদী দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাও তৎপর থাকে। আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত ও

www.bjilibrary.com

উন্নয়নশীল দেশে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় বহুজাতিক সংস্থাগুলোর অংশ গ্রহণেরও প্রমাণ রয়েছে।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর শর্ত

মুক্ত বাণিজ্য এলাকা, রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা হচ্ছে কোন দেশে বহুজাতিক সংস্থার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কেন পুঁজিবাদের পুঁজি বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছিল তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কোম্পানীর কর্মকর্তারা নিজেরাই বলেছেন : 'আমরা এমন একটি জায়গা চেয়েছিলাম যার একপ্রান্তে থাকবে চীন এবং অন্য প্রান্তে মার্কিন নৌবহর। খুব সহজে সামগ্রী, মানুষ ও অর্থ আনা নেয়া করা যায় এমন জায়গা আমাদের চাই। শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বাগে আনতে যেসব দেশের সরকার সক্ষম সেসব দেশেই কেবল আমরা পা দেই।'[৮]

এ থেকেই বুঝা যায় বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কেন এশিয়ার এ অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। তাদের পুঁজি যাতে বাজেয়াপ্ত বা জাতীয়করণ করা না হয় সে জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও তাদের কাম্য। এ জন্য তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করে এবং কৃষিতে পশ্চাৎপদতা দূর করার প্রয়োজনে বলিষ্ঠ কোন সংস্কার বা আমূল পরিবর্তনকারী পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। তাদের ইচ্ছেমত সাবসিডি উঠিয়ে নিতে, বর্ধিত সুদের হার নির্ধারণে, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি এবং ঘাটতি অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নিতে সরকারকে বাধ্য হতে হয়। অন্য কথায় বহুজাতিক কোম্পানীকে খুশী করার জন্য সরকারকে যেসব শর্ত পূরণ করতে হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. সস্তা শ্রম,
২. কাস্টমস শুল্ক মওকুফ,
৩. আমদানি বিধি-নিষেধের অনুপস্থিতি,
৪. বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার,
৫. অসীম মুনাফা সৃষ্টির নিশ্চয়তা,
৬. দীর্ঘ ট্যাক্স বিরতি,
৭. ধর্মঘট বিরোধী নির্যাতন মূলক শ্রম আইন,
৮. শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানা/কখনো কখনো শর্তসাপেক্ষে যৌথ মালিকানা ইত্যাদি,
৯. শ্রমঘন শিল্প স্থাপনের পরিবর্তে পুঁজিনিবিড় শিল্প স্থাপনের তাকিদ।

এ শর্তগুলোর মধ্যে সস্তাশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর ফলে তাদের উচ্চহারে মুনাফা নিশ্চিত হয়। এজন্য সস্তা শ্রমের দেশগুলোই বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের স্বর্গ।

www.bjilibrary.com

বহুজাতিক কোম্পানীর অবস্থান ও তাদের উচ্চহারের মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য দেশী শিল্প পণ্য সমূহের উপর বেশি শুল্ক আরোপ করা এবং পাশাপাশি বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর পণ্যসমূহকে শুল্কমুক্ত করার নিশ্চয়তাও আদায় করা হয়। এছাড়া ট্যাক্স হলিডে দেয়া, করপোরেট ইনকাম ট্যাক্স, ইমপোর্ট ডিউটিজ, প্রপার্টি ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হয় এবং নতুন নতুন আইনগত সুবিধা দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ব্যবসার ক্ষেত্র নিশ্চিত করা হয়।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর বহু ধরনের শাখা প্রশাখা থাকে। একই কোম্পানীর অধীনে বিভিন্ন নামে অসংখ্য কোম্পানী ছড়িয়ে থাকে। স্থানীয় কোন এজেন্টের সাথেও যৌথভাবে অনেক সময় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যার ফলে অনেক সময় বহুজাতিক কোম্পানীকে চিহ্নিত করাও দুরূহ হয়ে ওঠে।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর শোষণ প্রক্রিয়া চালু থাকার ফলে যে সব ঘটনা ঘটছে তা হচ্ছে ঃ

১. প্রাকৃতিক ও খণিজ সম্পদের ওপর বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর লোভাতুর দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে এর উত্তোলন, ব্যবহার শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদিতে দেশীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতার সুষ্ঠু ব্যবহার হয় না।

২. বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দেশে স্বাধীন প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সব সময়ই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রের গবেষকদের উল্লেখযোগ্য অংশকে কিনে নেয়ার চেষ্টা করা হয় বিভিন্ন স্কলারশীপ, প্রকল্প ব্যবসা, উচ্চ বেতনের চাকুরী ও বিদেশ সফর ইত্যাদির বিনিময়ে। কিনে নেয়া গবেষকগণ ভাড়াটিয়া গবেষক হিসেবে নিষ্ঠার সাথে বহুজাতিক কোম্পনীর স্বার্থ রক্ষায় কনসালটেন্ট, এ্যাডভাইজার, রিসোর্স পারসন হিসেবে কাজ করেন। সিভিল সমাজ নামে পরিচিত এসব ভাড়াটিয়ারা দেশ ও জাতির স্বার্থের প্রশ্নে একেবারে মৌন হয়ে পড়েন। কোন টু-শব্দ নেই, কোন কথা নেই।

৩. দেশীয় প্রচার মাধ্যমকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

৪. বহুজাতিক কোম্পানীগুলি মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় ভিত্তি গেড়ে বসে। বিকাশোন্মুখ জাতীয় শিল্প তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মুখে নিঃশেষ হয়ে যায়।

৫. বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর শোষণ প্রক্রিয়ায় অর্জিত মুনাফার একটি অংশ দালালরা পেয়ে স্ফীত হয়, দেশে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সংকট গভীরতর রূপ নিতে থাকে।

নিউ জার্সির স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা। স্টান্ডার্ড অয়েল এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় জনসাধারণকে কি পরিমাণে শোষণ করছে তার একটা হিসাব পল ব্যায়ান ও পল সুইজী[৯] দিয়েছেন। তারা বলেছেন ১৯৯২ সালে স্টান্ডার্ড অয়েল মোট মূলধনের ৬৭% ভাগ মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বিনিয়োগ

www.bjilibrary.com

করে। কিন্তু লাভ পায় ৩৪% ভাগ। অপরপক্ষে মূলধনের ২০% ল্যাটিন আমেরিকায় বিনিয়োগ করে লাভ করে ৩৯% ভাগ এবং পূর্ব গোলার্ধে মূলধনের ১৩% বিনিয়োগ করে লাভ করে ২৭% ভাগ। অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ মূলধন বিনিয়োগ করে লাভ হয় এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশ বিনিয়োগ করে লাভ হয় দুই তৃতীয়াংশ। এর থেকে খুবই স্পষ্ট যে কি পরিমাণ শোষণ স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী করছে। আর একটি উদাহরণ নেয়া যাক। ১৯৯৭ সালে কোলগেট-পামওলিভ (Colgate-Palmolive) কোম্পানী যা লাভ করেছিল তার অর্ধেকের বেশী এসেছিল বিদেশ থেকে। এ হল বহুজাতিক কোম্পানীর লাভের বহর। আর বিপুল লাভ মানে বল্গাহীন শোষণ। জেনারেল মোটরস (General Motors) হোল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৭ সালে এই কোম্পানীর মোট উৎপাদন মূল্য জাতিসংঘের ১৯০টি দেশের মধ্যে ১১২টি রাষ্ট্রের প্রত্যেকের মোট জাতীয় উৎপাদনকে (G.N.P) ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[১০]

৩. অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণ

পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অন্যান্য সহযোগীরা নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের সাহায্যে তাদের আধিপত্য ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল ভূখন্ডের উপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। পুঁজিবাদী শক্তি প্রথমতঃ অনুগত সরকার বা মুৎসুদ্দি সরকার (Comprador Governments) গঠনের মাধ্যমে তাদের কাজ হাসিল করে। মুৎসুদ্দি অনুগত সরকারের কাজ হল পুঁজিবাদী নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হুকুম অনুযায়ী চলা। এ সমস্ত সরকারকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শোষণের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক এলিট, সাবেক সামরিক এলিট ও সাবেক আমলাদের সাথে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোপন লেনদেন ও যোগাযোগ থাকে। বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর পরোক্ষ প্রভাবে মুৎসুদ্দি সরকার পরিচালিত হয় এবং প্রতিদানে এরা নানারকম আর্থিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। লাভের ভাগ পায়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে শোষণ করার পথ এরা এইভাবে কন্টকহীন করে। মুৎসুদ্দি সরকার যদি কোন কারণে পুঁজিবাদী অধিপত্যবাদীদের মর্জি মত চলতে অস্বীকার করে অথবা সরকারের মধ্যে কোন গোলমাল দেখা দেয় তাহলে কাল বিলম্ব না করে সে সরকারের পতন ঘটান হয় এবং তার স্থলে নতুন অনুগত সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই পুঁজিবাদী বিদেশী শক্তি বা তাদের প্রতিনিধিরা সরাসরি মঞ্চে আবির্ভূত হয় না। দেশের কোন না কোন গোষ্ঠীকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। সরকারের উত্থান-পতন বা সামরিক অভ্যুত্থান একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। এই ভাঙ্গাগড়ার কাজে পুঁজিবাদী মোড়ল দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে কাজে লাগানো হয়। এরা স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোন রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ যেন না ঘটে সেদিকে কড়া নজর রাখে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে ইসলামী রেনেসাঁর প্রতি যুব সমাজের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সমস্ত দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এ ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠছে যে দেশ ও জনগণের মুক্তি ও উন্নতির জন্য ইসলামের বাস্তবায়ন

www.bjilibrary.com

অপরিহার্য। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ইসলামের মুকাবিলায় সভ্যতার সংঘাতের নামে বর্বরতাকে উস্কে দিয়েছে। এরা সুনিপুণভাবে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

৪. সাংস্কৃতিক শোষণের কৌশল

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী শক্তিধরদের রণকৌশল হিসেবে সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, Cultural Imperialism বা cultural Aggression ইত্যাদি পরিভাষাগুলো গোটা বিশ্বের একাডেমিসিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগ্রাসী সংস্কৃতি হচ্ছে 'A victory without war' আর এই অদৃশ্য যুদ্ধের সৈনিকরা হচ্ছেন পরজীবী সুশীল সমাজ, দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মী, ভাড়াটিয়া রাজনীতিবিদ এবং সংশ্লিষ্ট মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী। একটি জাতি তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যে চেতনার বলে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সে চেতনাকে ভোতা করে দেয়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। যুদ্ধ বা আগ্রাসন তিন ধরনের হতে পারে। একটি সামরিক আগ্রাসন, একটি অর্থনৈতিক আগ্রাসন এবং অপরটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এই তিনটিরই উদ্দেশ্য এক. দেশ জয় করা- সেই দেশের ওপর আধিপত্য কায়েম করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা দেখে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভাবতে লাগল যুদ্ধ ছাড়াই একটি দেশকে কিভাবে কব্জা করা যায়। অর্থনৈতিক শোষণের পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে তারা দেখল একটি দেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ, অহংবোধ, জাতিসত্তা মুছে দিতে পারলেই চিরস্থায়ীভাবে সেই দেশটিকে পদানত করে রাখা সম্ভব। এই চিন্তার ফলশ্রুতি হিসেবেই আবিষ্কৃত হল সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল আর আগ্রাসনের বর্তমান ধারা। এর বাহন বা মূল অস্ত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে প্রচার মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি প্রকাশের বিষয়বস্তুকে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া যা মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে পরিচিত গরীব ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় খুবই তৎপর মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। উপনিবেশবাদী প্রচার মিডিয়াসমূহ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলোকে যেমন নাচ, গান, নাটক, সিনেমা, থিয়েটার, সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতিকে এমনভাবে ব্যবহার করার কৌশল উদ্ভাবন করে যাতে করে এগুলোর মাধ্যমে প্রান্তদেশের মানুষদের মধ্যে সংস্কারবদ্ধতা, শিকড়হীন অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক কসমোপলিটন ইজম, ধর্মের প্রতি অনাস্থা, স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি হীনমন্য বৃত্তিগুলো মাথাছাড়া দিয়ে ওঠে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মিডিয়া শক্তির সাহায্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে স্বনির্ভর স্বাধীন দেশের মানুষ গুলোর মধ্যে এমন একধরনের হীনমন্যতাবোধ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়– যাতে প্রভুর নির্দেশে মোহাচ্ছন্নের মত তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিরোধ শক্তি এবং আত্মরক্ষার প্রাচীরটিকে গুঁড়িয়ে দেয়। এটি বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদের এক নতুন রণকৌশল। কারণ বর্তমান বিশ্বে স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখ তার প্রতি জাতিসমূহ এত স্পর্শকাতর যে একটি কুয়েত আক্রান্ত হলে গোটা বিশ্ব তার আজাদীর জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু লেখাপড়া, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, শিল্পকলা

www.bjilibrary.com

দ্বারা যদি একটি দেশকে জয় করা যায় তাহলে তার আজাদীর জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। তাই পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল ও আগ্রাসনই হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক।

সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল ও আগ্রাসনের কবলেই দেশের অভ্যন্তরে হু হু করে বিদেশী অর্থে প্রতিপালিত বিশেষ গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনীতিতে বিদেশী বশংবদ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিরাট অংশ বিদেশী স্কলারশিপ, পদক, খেতাব, পুরস্কার এবং নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে লালায়িত হয়ে আত্মবিক্রয় করে বিদেশের গোলাম শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বসে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে তারা নিজেদের মেধা নিয়োজিত করে থাকে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধের শত শত মিসাইল মুসলিম দেশসমূহের নতুন প্রজন্মের ইসলামী চেতনা বিশ্বাসকে চুরমার করে দিচ্ছে।

৫. আন্তর্জাতিক অর্থায়নে পরিচালিত সেকুলার এনজিওসমূহ

বর্তমান বিশ্বে কর্মতৎপর সেকুলার এনজিওসমূহ পুঁজিবাদী নব্য সাম্রাজ্যবাদের ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করছে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীলদেশগুলোতে তারা শোষণের জাল বিস্তার করেছে। এদের আসল এজেন্ডা জনগণের সেবা বা দারিদ্র্য বিমোচন নয়, বরং অন্যকিছু। এরা এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদকেই লালন করছে। বড় বড় এনজিওগুলো গড়ে তুলছে বিশাল বাণিজ্য সাম্রাজ্য এবং সুউচ্চ ভবন। চড়া সুদের ব্যবসায় তাদের তৎপরতা নব্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দিকটিই সুস্পষ্ট করে তোলে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি এনজিওদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করছে। সরকারী সাহায্যের (Official Aid) পরিবর্তে বেসরকারী পুঁজিপ্রবাহকে বর্তমানে অধিকতর মাত্রায় উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পুঁজিবাদী শোষণের অন্যান্য কৌশল

১. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ মতলবে শিল্পায়ন অনুমোদন : পুঁজিবাদী শোষকরা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও বিশেষ কৌশলের অংশ হিসেবে শিল্পায়ন অনুমোদন করেছে। কিন্তু তা হতে হবে বিশেষ ধরনের শর্তাধীন। যেমন মূল পাইলট প্লান্টন কেন্দ্রে (Metropolis) রেখে সাব কন্ট্রাক্ট (Subcontract) এর ব্যবস্থা করা বা আংশিক প্রক্রিয়াজাতকরণ (Partial processing) এর জন্য প্রান্তে (Periphery) শিল্পের শাখা গড়ে তোলা। খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন, প্রাথমিকভাবে কাঁদামালের অধি প্রসেসিং, শ্রমঘন ও বেশী বিদ্যুৎ এবং শক্তি প্রয়োজন এমন শিল্প পুরোটা বা তার অপারেশনের অংশ বিশেষ (Partial operationing), পরিবেশ দুষিত হতে পারে (Environmental pollution) এমন সব রাসায়নিক ঔষধ শিল্প (Chemical pharmaceutical Industry) ইত্যাদি সবই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা এখন তৃতীয় বিশ্বে স্থানান্তর

www.bjilibrary.com

করতে প্রস্তুত। তবে এসব ক্ষেত্রে তারা মূলত মিশ্র উদ্যোগ এবং বহুজাতিক কোম্পানীর সংগে স্থানীয় পুঁজিবাদী এজেন্টদের সংযুক্ত উদ্যোগের পক্ষপাতি।

২. শেয়ার/স্টক মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ।

৩. মুদ্রার উপর হামলা (মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে ১৯৯৮ সালে যা হয়েছে)।

৪. অর্থনৈতিক, সামরিক এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা (ইরান, সুদানের ওপর যা চলছে)।

৫. বিশ্বব্যাপী ইসলামবিরোধী ক্রুসেডে মৌলবাদী খৃস্টান, ইহুদী ও হিন্দুত্ববাদীদের একযোগে কাজ করা।

৬. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রভু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর না করেই পারে না। আর অনুন্নত দেশটির আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হবে কি না, কতটুকু হবে সেটা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর স্বার্থ দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

৭. পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বজোড়া গণমাধ্যমকে (রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, সংবাদপত্র, সাংস্কৃতিক সংস্থা ইত্যাদিকে) নান ধরনের আর্থিক ও প্রকৌশলী সাহায্য দিয়ে তাদের ভাবধারা, জীবনাচারণ ও আদর্শকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

৮. পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে বহু শিক্ষিত ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি এবং অতি অল্প সময়ে পিএইচডি ডিগ্রি দিয়ে ঐ সব দেশে পাঠিয়ে দেয় তাদের ভাড়াটিয়া হিসেবে কাজ করার জন্য।

পাশ্চাত্যের অধিকাংশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই বর্তমানে ধর্মান্ধ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই মুসলিম বিশ্বকে এই নব্য সাম্রাজ্যবাদী এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠী তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসে নতুনভাবে দীক্ষিত (Born Again) গোঁড়া খৃস্টান, উগ্রজাতীয়তাবাদী ইহুদী এবং চরম সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সমন্বয়ে গঠিত মোর্চা বিশ্বব্যাপী তাদের আগ্রাসী তৎপরতা চালানোর তাত্ত্বিক অনুপ্রেরণার লাভ করছে স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের তথাকথিত ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন থিওরী থেকে। বিগত এক যুগ ধরে যে সব মুসলিম রাষ্ট্র পুঁজিবাদী মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তথাকথিত ইচ্ছুকদের মোর্চা (Coalition of the willing) দ্বারা আক্রান্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে সেই দেশগুলোর ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে শোষণ আগ্রাসন প্রক্রিয়ার একটি পরিষ্কার প্যাটার্ন বিশ্ববাসীর কাছে দৃশ্যমান হয়।[১১]

সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দ্যোতক নয়। ১৭৭৫ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত

www.bjilibrary.com

করতে পেরেছিল। কিন্তু দেড়শো বছরের বেশি সময় রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও একই রকম। যত দিন ল্যাটিন আমেরিকা বা মধ্যপ্রাচ্য খনিজ তেল ও কাঁচামালে সমৃদ্ধ থাকবে ততদিন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে না। নব্য সাম্রাজ্যবাদ বা নব্য উপনিবেশবাদ যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে শোষণের নিত্য-নতুন কৌশল বের করবে। এছাড়াও পুঁজিবাদের মধ্যেই এর সংকটের কারণ নিহিত আছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত রকম কলাকৌশলের দ্বারস্থ হোক না কেন সংকট থেকেই যাবে। তাই বলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসক ও শোষক গোষ্ঠী শোষণের কলাকৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের কখনোই শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেবে না। মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভক্তির মাধ্যমে মানবিক সংহতি নষ্ট করে জনে জনে প্রতিহিংসামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং তার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির মুনাফা কামানোই তাদের শোষণ কৌশলের অংশ। যুদ্ধবাজ মুনাফা কামাতে ব্যর্থ হলে, যুদ্ধাবস্থা মুনাফা কামাবে। পুঁজিবাদী নব্য সাম্রাজ্যবাদের নব নব কৌশলের কাছে যেন বিশ্ববাসী জিম্মি হয়ে গেছে। মন্দা ও বিশ্বব্যাপী সামাজিক ঘৃণা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পুঁজিবাদীরা শেষ পর্যন্ত খৃস্ট সাম্রাজ্যবাদকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ধাক্কা দেয়ার সময় হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সংকট কাটাতে যে যুদ্ধ পরিকল্পনা পুঁজিবাদীরা কৌশল হিসেবে নিয়েছে সেটি মানবিক ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিহত করা এবং অমানবিক জঙ্গীভাব পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিকপন্থায় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের মুনাফা সংগ্রহের কৌশলকে অকার্যকর করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নিয়ত বিস্তারকে রুদ্ধ করতে হবে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘণ্টা বেজে গেছে। তারা একঘরে হবেই। এখন প্রয়োজন সর্বাধিক বিভাজন পরিহার করে পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে মানবিক ও আদর্শগত ঐক্য গড়ে তোলা।■

তথ্যসূত্র

১. The Bangladesh observer, Dhaka, September 20, 1989

২. দি বাংলাদেশ অবজারভার, পূর্বোক্ত।

৩. Global Poverty Up: A Result of Webt and Environmental Decline; The Bangladesh Observer, Dhaka, নভেম্বর ২৭, ১৯৮৯

৪. প্রফেসর আবদুস সালাম, 'Ideals and Realities' lecture given at the University of Stockholm on 23rd of September, 1975.

৫. একটি পারমাণবিক যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের জন্য International Organization for the prevention of Nuclear war (IOPNW) এর উদ্যোগে জার্মানীর কোলন শহরে অনুষ্ঠিত পদার্থবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রদত্ত প্রফেসর ভিকটর সিডেলের বক্তৃতা, উদ্ধৃত করেছেন Farida Ignatious, 'News letter from West Germany' in the Bangladesh Times, Dhaka, June 16, 1986.

৬. বিগত ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬ 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে জাতিসংঘের তদানীন্তন

www.bjilibrary.com

মহাসচিব প্যেরেজ দ্যা কুয়েলার এই হিসেব প্রদান করেছেন। দেখুন দি বাংলাদেশ অবজারভার, ঢাকা, অক্টোবর ১৮, ১৯৮৬। তিনি আরো অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে ১২০ কোটি নারী, পুরুষ ও শিশু চরম দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে এবং এদের মধ্যে ৫০ কোটি দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে ভুগছে। কুয়েলারের মতে, যুদ্ধাস্ত্রের পেছনে প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাই অর্থ ব্যয় হচ্ছে, এর একদিনের খরচ যদি খাদ্য উৎপাদনে বৃদ্ধি ও বিতরণে ব্যয়িত হতো, তাহলে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা নিরসনে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যেতো।

৭. প্রফেসর ভিকটর সিডেল, পূর্বোক্ত।

৮. 'Transnational Corporation and Export' –Dipak Nayar, Economic Journal, মার্চ ১৯৭৮-এ উদ্ধৃত

৯. Paul A. Banaa and Paul M. Sweezy- Monopoly Capital, P. 193

১০. Modern Capitalism, Moscow, P. 231

১১. ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে আগের উপনিবেশবাদের বিলুপ্তি ঘটে এবং ২১ শতকে আবারও এই তৎপরতা বিশ্বরাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছে। ইউরোপীয়রা আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বেই কলোনী স্থাপন করেছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সামনে রেখে। এটি সুস্পষ্ট যে পুঁজিবাদী মার্কিন নয়া সাম্রাজ্যবাদ সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। আফগানিস্তানে তো এক রকম কলোনী তৈরি হয়েই গেছে। পূর্বতন উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী যেমন স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দনীয় প্রতিনিধি বাচাই করে পরোক্ষভাবে শাসন করতো আফসানিস্তান ও ইরাকে একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম– বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক এবং ব্যাংকার– ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২৯শে নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.bjilibrary.com

সেমিনার-প্রতিবেদন

মোশাররফ হোসেন খান

■

ইউরো-আমেরিকান সমাজের অন্ধকার দিক

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, পাশ্চাত্য সমাজে আজ ধস নেমেছে। কেন নামলো সেটা আজ বিশ্লেষণের বিষয় বটে। ইতিহাস চলমান। কোনো ক্ষমতাদর্পীই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। পাশ্চাত্যও পারছে না। এর একটি অন্যতম কারণ– তারা বস্তুজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদ ও আমিত্ববাদই তাদের মূল দর্শন। আর এই দুটোই তাদের ধ্বংসের পথ প্রসারিত করেছে। মার্কিন চায় তারাই গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তাদের হাতেই থাকবে কেবল অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র। অন্য দেশ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তারা সদা তৎপর। বলা বাহুল্য, তাদের এই একগুঁয়েমি এবং অহমের কারণেই আজ তারা নৈতিক বিপর্যয়ের শিকার। তাদের এই অধপতন শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা কেউ ধারণাও করতে পারে না। পাশ্চাত্যের ধ্বংস অনিবার্য। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত– 'ইউরো-আমেরিকান সমাজের অন্ধকার দিক' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. মাহফুজ পারভেজ, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ প্রমুখ।

সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, মুসলিম বিশ্বকে দেবার মতো পাশ্চাত্যের কিছুই নেই। না আদর্শ, না নৈতিকতা, না জীবনের কোনো দিক-নির্দেশনা। তারা কেবল পেশী শক্তির বলে বিশ্বকে নিজের কবজায় রাখতে চায়। আমাদের উচিত তাদের অন্ধ অনুকরণ না করে সত্য জীবন দর্শনের নীতি অনুসরণ করা। আর সেটা হলো আল ইসলাম। ইসলামের শিক্ষায় আমরা আলোকিত হয়ে উঠলে, আল কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারলে এবং রাসূলের [সা] পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলে পাশ্চাত্য কেন, আমাদের কারুরই মুখাপেক্ষী হবার কথা নয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের অন্ধ গোলামী থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে এবং বিশুদ্ধ চিন্তার বিকাশ ঘটাতে হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, পাশ্চাত্যের অনুসরণ করতে গিয়েই আমাদের সমাজ কাঠামোও আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। এই সমূহ পতন থেকে রক্ষা করতে পারে একামত্র ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা। কারণ এখানেই রয়েছে আমাদের জন্য মুক্তির পথ। এখন প্রয়োজন ইসলামের আলোকে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে আলোকিত করে তোলা। তাহলেই পাশ্চাত্যের খপপর থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, পাশ্চাত্যের বিশ্বাসটাই হলো অপবিশ্বাস। পাশ্চাত্যের দার্শনিক ভিত্তির মধ্যেই গলদ রয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে অনুকরণ বা অনুসরণ করার কোনো যুক্তি নেই। নিজস্ব আদর্শ-ঐতিহ্য অনুসারেই আমাদের চলা উচিত। সেটাই বাঞ্ছনীয়।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, পাশ্চাত্য সমাজের আরও বহু অন্ধকার দিক রয়েছে। সেগুলোও উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। কি কারণে সেখানে আজ ধস নেমেছে সেই বিষয়টি আমাদের সমাজে আরও বেশী করে তুলে ধরা উচিত। আমাদের বুঝাতে হবে যে, যখন থেকে পাশ্চাত্য ধর্ম থেকে তাদের রাজনীতিকে পৃথক করেছে তখন থেকেই সেখানে নৈতিক অধপতন শুরু হয়েছে। আর এখন তো তারা নৈতিকতার দিক দিয়ে একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে। দিয়ে একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। ফলে তাদেরকে অনুসরণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, পাশ্চাত্যে আমরা কি দেখি? দেখি সেখানে বর্ণবাদ আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, হিংসা-বিদ্বেষ আছে, অনৈতিকতার সয়লাব

www.bjilibrary.com

আছে। তারা একেকটি যন্ত্রজীব। মানবতা ও মূল্যবোধ কাকে বলে, সেটা তারা জানে না। তারা কেবল দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদের শোষণের ওপর। সত্য বলতে, পাশ্চাত্য এখন পরাজিত। ফলে তাদের অনুসরণ না করে আমরা কিভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি, সেটাই আমাদের চিন্তা করা উচিত।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, পাশ্চাত্যের এক মুখরোচক রাজনৈতিক শ্লোগান হচ্ছে– নারীর ক্ষমতায়ন। পাশ্চাত্যই যেন এর প্রবর্তক বা অগ্রদূত! অথচ সেই পাশ্চাত্যেই নারীর অবমূল্যায়ন হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। তারা মানুষ ও মানবতার ধারে কাছেও আছে কি? চিন্তা করা যায়– তারা জীব-জানোয়ারের সাথে ঘর-সংসার করে, ব্যভিচারের সয়লাবে ভেসে চলেছে গোটা পাশ্চাত্য! জন্তু-জানোয়ারের সাথে এবং সেখানকার নারীর সাথে তাদের একই আচরণ। আবার তারাই গলা উঁচিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে। এটা হাস্যকর নয় কি? আসলে জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের কোনো তুলনা নেই। আল্লাহপাক যেমন অতুলনীয়, ঠিক তেমনি তাঁর জীবন বিধানও অতুলনীয়। আমাদের কাজ হচ্ছে পাঠককে সেই কল্যাণকে জানিয়ে দেয়া, চিনিয়ে দেয়া। নিঃসন্দেহে কাজটি খুব সহজ– এমন নয়। তবুও আমরা সেটা করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন কেবল আমাদের বিশুদ্ধ চিন্তা, পরিশ্রম এবং লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলার সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি।

ড. মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ বলেন, পাশ্চাত্য এখন পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছে জাগতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের পেছনে। অর্থই যে সকল অনর্থের মূল– পাশ্চাত্য সেটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এখন সচেতন হবার সময় এসেছে। আমরা যদি সচেতন হই তাহলে পাশ্চাত্যের করাল গ্রাস থেকে আমরা ইনশাআল্লাহ মুক্তি পাবো।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান বলেন, "পশ্চিমা বিশ্বের বিপুল বিত্ত ও বিজ্ঞানের জ্ঞান তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই বিবেচনায় তাদেরকে নিতান্ত দুর্ভাগা না বলে উপায় নেই। কিন্তু তাদের চেয়েও বড় দুর্ভাগা হলাম আমরা, যারা তাদের অন্ধ অনুকরণে বদ্ধপরিকর, যারা মিথ্যা স্বর্গের তালাশে আপন সোনালী সমাজের কবর নিজ হাতে খনন করি। আমাদের সমাজ এমনকি অবক্ষয়ের এই নষ্ট সময়েও পশ্চিমা বিশ্বের যে কোন দেশের চেয়ে বেশী নিরাপদ ও শান্তিময়। আর আদর্শ ইসলামী সমাজ যদি বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়, তবে তা-ই দিতে পারবে সকলপ্রকার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এটি কোন অলীক কল্পনা নয়। মহানবী [সা] ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে তো বটেই নানা যুগে নানা দেশে ঈমানদার শাসকদের শাসনামলেও শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ উপহার দিয়েছে আমাদের কালজয়ী আদর্শ ইসলমা।"

তিনি বলেন, "ড. গ্রে মুসলিম সমাজের সেই নমুনা দেখে সবিস্ময়ে তাকে 'পরীর রাজ্য' বলেছেন, যে সমাজে ইসলাম আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে।... জড়বাদ-ভোগবাদের যে জোয়ার বিশ্বব্যাপী চলছে তার ঝাপটা থেকে এ-সমাজ একেবারে মুক্ত নয়। তথাপি ইসলামী বিধান জারি থাকার কারণে তা

www.bjilibrary.com

এক সচেতন পাশ্চাত্যবাসীর চোখে "পরীর রাজ্য" মনে হয়েছে। ইসলামকে তার সমুদয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে কায়েম থাকতে দেখলে তিনি তাকে বর্ণনার ভাষাই খুঁজে পেতেন না।

জড়বাদী-ভোগবাদী সভ্যতার এখন স্বর্ণযুগ। এ সভ্যতা মানবতাকে কি দিতে পারে বিশ্ব তা দেখছে। বিশ্ব এটাও দেখেছে ইসলাম তার স্বর্ণযুগে কি দিয়েছে এবং যুগে যুগে কি দিয়ে আসছে। এই দু'টি বিপরীত চিত্র সামনে থাকার পরও যদি আমরা অন্ধের মত পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি, তাহলে আগামী প্রজন্ম আমাদের কবরে থুথু নিক্ষেপ করে বলবে, "এই নির্বোধের দল আমাদের জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দিয়ে গেছে।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক উপস্থিতি ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশারফ হোসেন খান।

বাংলাদেশে এনজিও তৎপতা

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, বাংলাদেশ ক্রমশ এনজিও তৎপরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। বিদেশী ডোনাররা যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী, সেই কারণে তারা আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। গরীব দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারও তাদের কাছে নতজানু থাকতে বাধ্য হয়। শুধু বাংলাদেশেই নয়, অধিকাংশ মুসলিম দেশেই এনজিও কার্যক্রম চালু রয়েছে। তারা তাদের মিশনে সফলও হচ্ছে। তাদের বহুবিধ টার্গেট রয়েছে। অর্থনেতিক দুর্বলতার সুযোগে তারা মুসলিম দেশগুলোর স্বতন্ত্র আদর্শ, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি ধ্বংস করে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের প্রচেষ্টায় তৎপর রয়েছে। এনজিওদের ব্যাপারে আমাদের সার্বিক সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন।

গত ১১ই মার্চ, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত– "বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতা" শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মাহফুজ পারভেজ। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তওহীদ হুসাইন, মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, শাহাদাতুল্লাহ টুটুল প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, এনজিও বিষয়টি বেশ পুরনো।

www.bjilibrary.com

তার প্রভাবও পড়েছে সমগ্র বাংলাদেশে। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। কোনো মুসলিম দেশ দরিদ্র থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর প্রধান কারণ– এখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই। আমাদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই এদেশে এনজিওরা প্রবেশ করেছে এবং তারা তাদের দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে শক্তি অর্জন করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন ইসলাম ঘোষিত ইনসাফভিত্তিক আদর্শিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলা। আমরা যদি এনজিওদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে চাই তাহলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার কোনো বিকল্প নেই।

ড. এম. উমার আলী বলেন, আমাদের দেশে এনজিওরা সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ করছে। তারা এ দেশের মানুষের আদর্শ, ঐতিহ্য এবং ইসলামের চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কূটকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, ইসলামের প্রসার যখন ঘটেছে, তখন থেকেই সেবামূলক কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবার কারণে আজ নানাভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছি। এখনও যদি আমরা ইসলামকে অনুসরণ করি, তাহলে এনজিও কেন, কোনো অপতৎপরতাই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না।

মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, এনজিওরা আমাদের দেশের অভাব, দারিদ্র্য এবং হতাশাকে কাজে লাগাচ্ছে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা না থাকার কারণে এনজিওরা স্বেচ্ছাচার হয়ে উঠেছে। তারা উচ্চ হারে সুদ চাপিয়ে দরিদ্র জনসাধারণকে আরও হত দরিদ্র ও নিঃশেষ করছে। তাদের নির্যাতন, শোষণ আর নিষ্পেষণের যাঁতাকলে বন্দি হয়ে পড়েছে গোটা বাংলাদেশ। তাঁরা যেন প্রতিরোধ্য। তাদের মুকাবিলা করার মতো কৌশল ও শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, এনজিওদের অন্ধকার ও দুর্নীতির দিকগুলো আরও বেশী করে জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের খবরদারি করা প্রয়োজন। এনজিওদের জন্য সরকার একটি সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করে দিতে পারেন, যার আলোকে এনজিওগুলো পরিচালিত হতে বাধ্য হবে। তাহলেই এনজিওদের শোষণের দৌরাত্ম্য কমতে পারে।

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, আমরা আজ এনজিওদের ভয়াবহ চিত্র দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। তারা আমাদের ধর্মীয়, ঐতিহ্যিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এমনকি তারা আমাদের পারিবারিক বন্ধনকেও ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যাপকহারে জনমত তৈরি করে তাদের এই ঘৃণ্য তৎপরতাকে প্রতিহত করা প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তওহীদ হুসাইন বলেন, এনজিওদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় আমাদের দেশে অপরাধপ্রবণতা আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এনজিওদের দারিদ্র্য বিমোচন নীতি একটা ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকাতভিত্তিক সমাজ কাঠামো গড়তে পারলে এদেশ তাদের শোষণ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ড. হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন বলেন, এনজিওদের ঘৃণ্য তৎপরতা আজ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কতিপয় রাজনৈতিক দল এনজিওদেরকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে। তারা আমাদের আদর্শ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

জনাব শাহাদাতুল্লাহ টুটুল বলেন, এনজিওদের নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণার প্রয়োজন। কেননা তারা আমাদের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। এনজিওরা এখন রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। তারা এই দেশ ও জাতির জন্য একটি দগদগে ক্ষত। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সকলপ্রকার তৎপরতা আরও বেগবান করা প্রয়োজন।

ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান বলেন, এনজিওরা বাংলাদেশের দরিদ্র মুসলমানদেরকে কৌশলে ধর্মান্তরিত করছে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি মাঠে নেমেছে। সুতরাং এনজিওদের তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য আমাদেরকে প্রয়োজনীয় শক্তি সাহস এবং কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান বলেন, এনজিওদেও অপতৎপরতায় আজ গোটা দেশ ছেয়ে গেছে। তাদেরকে মুকাবিলা করতে হলে মুসলিম এনজিওগুলোকে আরও বেশী শক্তিশালী হতে হবে এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। দেশের মানুষকে ভালো কিছু উপহার দিতে পারলে তারা এনজিওদের জাল থেকে মুক্তি পাবে। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে তারা মূলত শোষণই করে খাচ্ছে। যদি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকতো, যদি ইসলামী অর্থনীতি সমাজে চালু থাকতো তাহলে এনজিওদের অপতৎপরতা বোধ করি বন্ধ হয়ে যেত।

মূল প্রবন্ধে ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, "এমনিতেই এনজিওসমূহ তাদের দাতা ও নিয়ন্ত্রকদের আদর্শ, বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সাংবাৎসরিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত গতিতে চালিয়ে থাকে; যাতে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতিকে দাতাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী প্রভাবিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

- ❖ এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করার নামে সুদ ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্তিত করা;
- ❖ মানবাধিকার রক্ষার নামে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা, ধর্ম ও জাতীয়তার মানুষকে উত্তেজিত করে সম্প্রীতি বিনষ্ট করা;
- ❖ বিদেশে বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ, সমস্যাগ্রস্ত, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারী

www.bjilibrary.com

নির্যাতনের কল্পিত চিত্র তুলে ধরে দেশের ইমেজ নস্যাৎ করে ঋণ-সাহায্য-অনুদান হাসিলের চেষ্টা করা;

- ❖ নারীর ক্ষমতায়নের নামে চিরায়ত পরিবার প্রথা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা;
- ❖ উয়ন্নুনের ছদ্মাবরণে দেশের পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত ও দরিদ্র অঞ্চলে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করা;
- ❖ জাতীয় ঐক্যমতের মৌলিক বিষয়বস্তু, যেমন, ধর্ম স্বাধীনতার চেতনা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতির সদস্যদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য প্রসার করা;
- ❖ জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতিকে বাংলাদেশে আপামর মানুষের চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাসের বিপরীতে পশ্চিমা ভোগবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আত্মতুষ্টিবাদের আলোকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা;
- ❖ সর্বাবস্থায় ধর্ম তথা ইসলামকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা;
- ❖ গ্রামে-গঞ্জে ইসলামী বিধান ও জীবনাচারের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ অবস্থান তৈরি করা;
- ❖ আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় পাঠ্যক্রমের বিপরীতে পশ্চিমা ভোগবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চেতনা জনগণের মধ্যে প্রচারে সচেষ্ট থাকা;
- ❖ পত্র-পত্রিকা-টিভি-রেডিও তথা মিডিয়াকে কবজা করে তাদের এবং দাতা গোষ্ঠীর আদর্শ-উদ্দেশ্য-মতবাদের বিস্তার ঘটানো;
- ❖ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তৎপরতা ও প্রণোদনা দিয়ে তাদের লুক্কায়িত রাজনীতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শের আলোকে সামাজিক বিবর্তন ঘটিয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস, আদর্শ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিপরীত 'দাতা-পছন্দ' সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুপ্ত-সংগ্রাম করা।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

গ্রামীণ ব্যাংক : একটি পর্যালোচনা

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, গ্রামীণ ব্যাংক যা বলে তা করে না। এটাই তাদের নীতি। তারা দেশের দরিদ্র জনগণকে উপকার না করে বরং আরও নিঃস্ব করছে। যারা 'গ্রামীণ ব্যাংক' বলে দাবি করে, আসলে সেটি কোনো ব্যাংকের আওতায় পড়ে কি না, সেটাও আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে। কারণ তারা বাইরে থেকে কত টাকা কিভাবে আনে, কিভাবে সেটার ব্যবহার করে তার কোনো

www.bjilibrary.com

সঠিক তদারকি করা হয় না। তাদের প্রদত্ত ঋণ দ্বারা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া কখনই লাভবান হতে পারে না। গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালিত হয় ডোনার, গ্রামীণ সদস্য এবং তার কর্মচারীদের দিয়ে। তাহলে গ্রামীণ ব্যাংকের যে বিপুল এ্যাসেট– প্রকৃত অর্থে তার মালিক কে? প্রশ্নটা জাগাই স্বাভাবিক। আসলে গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের জন্য কল্যাণকামী কোনো ব্যাংক নয়, সেটা একটা শোষণের ক্ষেত্র মাত্র।

গত ২১শে এপ্রিল, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'গ্রামীণ ব্যাংক : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক সেমিনারে জনাব আবুল আসাদ সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে "গ্রামীণ ব্যাংক : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. এম. উমার আলী, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. এম. এ. সামাদ, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তওহীদ হুসাইন প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, মাইক্রোক্রেডিটের সাথে ইসলামের কোনো মিল নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীব্যাপী আজ সেটাই প্রচলিত। মাইক্রোক্রেডিট নয়, বরং যাকাতের হকদারকে তার প্রাপ্য পৌঁছে দিতে পারলেই সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিরাজ করবে। ধনী-গরীবের ব্যবধানটাও কমে আসবে। কারণ ক্ষুদ্র ঋণের অজুহাতে তারা আমাদের সর্বশেষ দুর্গ যে পরিবার– সেই পরিবারকেও ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। এতে করে সুখ-শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশা। সমস্যার পর্বতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ। গ্রামীণ ব্যাংকের এই ঘৃণ্য তৎপরতা কিভাবে রোধ করা যায় সেটা আজ আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। তার জন্য বাস্তবসম্মত কর্মকৌশল তৈরি করে সামনে এগুতে হবে।

ড. এম. উমার আলী বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকৃত চিত্র যদি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা যেত তাহলে তাদের সম্পর্কে মানুষের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তো। কিন্তু সেটাও করা সম্ভব হয়নি। আমাদের সমাজে যদি যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা যায় তাহলে গ্রামীণ ব্যাংকের মুকাবিলা করা সম্ভব হবে। দেশের মানুষকে জাগ্রত করে যদি ইসলামসম্মতভাবে ক্ষুদ্র ঋণের কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলেই কেবল গরীব-দুখী মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারবে।

ড. এম. এ. সামাদ বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক একটি নিছক বস্তুতান্ত্রিক সুদী এবং

www.bjilibrary.com

মহাজনী শোষণের ক্ষেত্র। উচ্চহারে সুদ গ্রহণই তাদের মূল ব্যবসা। সেই কারণেই এর অবসান আমাদের একান্ত কাম্য। যদি ইসলামী অর্থনীতির কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তাহলেই কেবল এইসব সুদী মহাজনদের শোষণ থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক আমাদের ঘরের মেয়েদেরকে বের করে পথে নামিয়ে দিচ্ছে। তারা আমাদের পরিবার ও সমাজপ্রথাকে ভেঙে দিচ্ছে। আল কুরআন সুদকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষণা করেছে, অথচ সেই সুদের ওপর ভিত্তি করেই তারা শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে প্রতিহত করতে না পারলে এই জাতির সমূহ ক্ষতি সাধিত হবে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক প্রকৃত অর্থে একটি এনজিও ব্যাংক। তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই, সেই জন্য যা খুশি তাই তারা অবাধে করে যাচ্ছে। তাদের কারণে দেশের তৃণমূল পর্যন্ত কেবল সংঘাতই বেড়ে চলেছে। তারা এদেশের মানুষের দারিদ্র্যকে ব্যবসার পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করছে, যেটা শুধু অনৈতিকই নয়, অমানবিকও বটে। গ্রামীণ ব্যাংকের শোষণ থেকে মানুষ মুক্তি চায়। তাদের মুক্তির জন্য আমাদের যথাযথ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রচারণা যত মুখরোচক, তাদের প্রকৃত কার্যক্রম তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের উদ্দেশ্য কেবল সুদী ব্যবসা করা এবং আমাদের আদর্শ, ঐতিহ্য, সমাজ ও পরিবারপ্রথাকে বিনষ্ট করা। তাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তওহীদ হুসাইন বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। গ্রামীণ ব্যাংক আমাদের মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা এই দেশ ও জাতির জন্য একটি অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মূল প্রবন্ধে জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন– "গ্রামীণ মডেলের ভাষায় চমক আছে, বিদেশীদের আকৃষ্ট করার জন্য ক্যারিসমা আছে। কিন্তু মানুষের অবস্থার বাস্তবতা এবং রক্ত মাংসের ঐতিহ্যের সাথে মিল নেই। সম্ভবত এ কারণেই দেশ বিদেশে তৃণমূল পর্যায় তাদের গ্রহণযোগ্যতা এখনো সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ব্যাংকটি তার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে ব্যাংকটি যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা বলাও ঠিক হবে বলে আমার মনে হয় না। গ্রামীণ ব্যাংক নিছক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি আর্থসামাজিক আন্দোলন ও একটি জীবন দর্শন যা নারীকেন্দ্রিক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য নগণ্য হলেও গ্রামের লজ্জাবতী নারীদের বের করে আনা এবং পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা সম্ভবত ব্যাংকটির সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই সাফল্য আমাদের আবহমানকালের মূল্যবোধকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং তার পরিণতি কি হবে তা এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে। ধর্মীয়

www.bjilibrary.com

বিশ্বাস ও সামাজিক আচারের কারণে সুদের প্রতি এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক একটা ঘৃণাবোধ ছিল। সুদখোরদের সাথে অনেকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়তে অপছন্দ করতেন। গ্রামীণ ব্যাংক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনানুষ্ঠানিক মহাজনী প্রথা ছড়িয়ে দিয়ে এই মূল্যবোধকে পরিবর্তন করতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়। নারী স্বাধীনতার পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা প্রচলনের লক্ষ্যে এ অবস্থাকে অনেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুতের পর্যায় বলে মনে করেন। তবে যেভাবে দেশব্যাপী এই ব্যাংকটির মুখোশ খসে পড়তে শুরু করেছে তাতে দর্শন ও কৌশল পরিবর্তন না করলে এই প্রতিষ্ঠানটি তার গ্রহণযোগ্যতা আরো হারাবে বলে মনে হয়।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

পশ্চিমা জগতের ইসলামফোবিয়া

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, 'ইসলামফোবিয়া' শব্দটি খুবই আধুনিক। বলা যায় একটা নতুন টার্ম। এর একটা নতুন কারণও আছে, সেটা হলো– আদর্শিক ও রাজনৈতিক ভাইমেন্‌শন। আমরা আজান দিয়েছি। শত্রুরা সেই আজান শুনেছে। কিন্তু যারা নামায আদায় করবে, তারা আজান শোনেনি। এ এক ট্রাজেডি বটে! ১৯৭৭ সালে যখন ইস্তাম্বুল বসে মুসলিম দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী ইসলামী রাষ্ট্র শতক হিসাবে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে প্রকৃতঅর্থে এক ভিন্ন ইতিহাস বেরিয়ে আসবে। সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু দু:খের বিষয় যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়নি। তবুও এই সিদ্ধান্তের ঘোষণাই পশ্চিমা জগতে ভীতির কাঁপন ধরিয়ে দেয়। এজন্যই পাশ্চাত্যের ইসলামফোবিয়া। এখন মিডিয়া যুদ্ধ চলছে। যেটা কলমের যুদ্ধের চেয়েও শক্তিশালী। পাশ্চাত্য সেই মিডিয়াঅস্ত্র ব্যবহার করছে ইসলামের বিরুদ্ধে। আমাদেরও উচিত মিডিয়ার ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করা। তাহলে আমরা তাদের মুকাবিলা করতে সক্ষম হব।

গত ৩১শে মে, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত "পশ্চিমা জগতের ইসলামফোবিয়া" শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. এম. উমার আলী। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. মুহাম্মাদ মনজুরে ইলাহী, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. এ.বি.এম. মাহবুবুল ইসলাম, শাহাদাতুল্লাহ টুটুল প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক

www.bjilibrary.com

সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, ইসলামের ইতিহাস যত পুরনো, ইসলামবিরোধিতাও ততোটাই পুরনো। ইসলামবিদ্বেষ পাশ্চাত্যের একটি অতি মজ্জাগত ব্যাধি। তারই ফলাফল– ইসলামফোবিয়া। কিন্তু একথা সত্য যে, বিরোধ যত বেশি হয়, আলোটাও ততোই দ্রুত বিস্তার লাভ করে। যেমনটি ঘটেছিল রাসূলের [সা] ক্ষেত্রে। বিরোধিতার কারণেই সেদিন মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অনেক বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। এখনও তাই হচ্ছে। ইসলাম বিরোধিতার মুকাবিলায় আমাদের করণীয় কি, সেটা আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, ইসলামফোবিয়া একটি প্রাচীনতম বিষয়। ক্রুসেডের ঘটনাকে আমাদের সামনে রাখতে হবে। পাশ্চাত্য বরাবরই ইসলামকে প্রতিরোধ করতে চায়। বিভ্রান্ত করতে চায় তারা গোটা বিশ্বকে। তবু আমি মনে করি ইসলাম তার পথেই এগুবে। কোনো অপশক্তিই ইসলামের গতিরোধ করতে সক্ষম হবে না।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, পাশ্চাত্য ইসলামকে প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেছে। কারণ একমাত্র ইসলামকেই তারা তাদের জন্য হুমকির কারণ বলে মনে করে। প্রকৃত অর্থে টিকে থাকার মতো তাদের কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। তাই তারা ধ্বংস হবার আগে আরও কিছু ধ্বংস করে যেতে চায়। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক থাকতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান রহমান বলেন, পাশ্চাত্যের ইসলামফোবিয়া একটি বহুমুখী ষড়যন্ত্রের অংশ। এটা আগ্রাসনের নামান্তর। তবে আমরা যদি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অটল থাকি তাহলে তাদের কোনো হুমকিতেই সন্ত্রস্ত হবার কথা নয়। ইনশাআল্লাহ ইসলামের বিজয় সূচিত হবে শত প্রতিকূলতার মাঝেও। আমাদের কেবল দৃঢ়মনোবলের সাথে আল্লাহর পথে কাজ করে যেতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, পাশ্চাত্যে ইসলামফোবিয়া ছড়িয়ে দিয়েছে ইহুদীরা। এদেশেও অনেকে ইসলাম সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের ষড়যন্ত্রই হলো গোটা বিশ্বে ইসলামভীতি ছড়িয়ে দেয়া। তারা তাদের মিশনে অনেকটা সফল হয়েছে। এখন ভাবতে হবে যে, এর মুকাবিলায় আমাদের করণীয় কি!

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, ইসলামকে অপছন্দ করে বলেই পাশ্চাত্য সকল সময় ইসলাম বিরোধিতায় মত্ত থাকে। এজন্য তারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে এখন ইসলামফোবিয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি, মানুষের মুক্তির জন্যই আল্লাহপাক রাসূলকে [সা] প্রেরণ করেছেন। আমরা যদি আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলি তাহলে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হবে ইনশাল্লাহ।

www.bjilibrary.com

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, পশ্চিমা জগৎ সকল সময় একটি প্রতিপক্ষ তার জন্য দাঁড় করিয়ে নেয়। এখন তারা ইসলামকে প্রতিপক্ষ মনে করছে। তারা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করছে, এমনকি মনস্তাত্ত্বিকভাবেও তারা ইসলামকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তিই ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য যথেষ্ট। এখন আমাদের প্রয়োজন ইসলামের দিকনির্দেশনগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা। তাহলেই পশ্চিমা জগতের ইসলামফোবিয়ার মুকাবিলা করা সম্ভব।

মূল প্রবন্ধে প্রফেসর ড. এম. উমার আলী বলেন, "ইসলামের পরে আধিযোজিত ফোবিয়া একটি গ্রীক শব্দার্থ যা ভীতি আতংক, ঘৃণা ও নিন্দা মিশ্রিত এক ভয়াবহ অবস্থার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শব্দগত অর্থ করলে ইসলামফোবিয়ার অর্থ বুঝায় ইসলাম সম্পর্কে অসঙ্গত ভীতি। 'কালচারের প্লুরালিজম' এবং গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে পশ্চিমারা নিজেদের যতই টলার‍্যান্ট হিসেবে দাবী করুক না কেন তারা ইসলামকে আদৌ বরদাশত করতে পারে না। ইসলামের বিধি-বিধান ও সামাজিক দর্শনের প্রতি খোলা ও মুক্ত মনের দৃষ্টি না দিয়ে তারা নিজেদের পোষণ করা বদ্ধমূল বিকৃত ধারণা দিয়ে তা এক ফোবিয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে। এই ভ্রান্ত উপলব্ধির বিশ্বায়নের লক্ষ্যে যা কিছু করণীয় তা কার্যকর করার জন্য তারা আধুনিক যাবতীয় টেকনোলজী ও উপকরণ, শক্তিশালী মিডিয়া, উপনিবেশবাদী চক্রান্ত মুসলিম বিশ্বের ওপর একযোগে প্রয়োগ করে। 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি প্রয়োগ করে উম্মাহর ওপর তারা পশ্চিমা সিভিলাইজেশনের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তাদের মূল টার্গেট ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার সমূলে বিনাশ সাধন করার যাবতীয় মেকানিজম কার্যকর করে। এই প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে পশ্চিমা জগতের ইসলামফোবিয়া।"

তিনি আরও বলেন, "পরমত সহিষ্ণুতা এবং অন্যদের যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর সেসবের কল্যাণের স্বীকৃতি দান ও তা গ্রহণে সহনীয়তা প্রদর্শন ইসলামফোবিয়া মুকাবিলা করার জন্য বড় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। যা কিছু হারাম ইসলামী শরীয়া তা স্পষ্ট করেই বর্ণনা করেছে। যা হারাম নয় তা হারাম করার এখতিয়ার কাউকে দেয়া হয়নি। সেই প্রেক্ষিতে ইসলাম যতদূর পর্যন্ত টলারেন্সের সীমানা দেয় তাকে তাকে কোন প্রকারেই সংকুচিত করা আজকের এই আধুনিক বিশ্বে সমীচীন হবে না।

আল কুরআন, তাফসীর গ্রন্থ কিংবা এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসম্বলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ কারো ঘরে থাকলে তা এত উচ্চ তাকে রাখা হয় যা ধূলি ধুসরিত হলেও অনেক সময় স্পর্শ করা হয় না। কারো মৃত্যুর পর, নতুন বাড়ী ঘর কিংবা ব্যবসা কেন্দ্র উদ্বোধনে এসব কিতাব মাওলানা কিংবা তালেবে-ইলমদের দ্বারা পড়িয়ে দু'আ করানোর জন্য কাজে লাগানো হয়। সাইয়েদ আবুল আলাম মওদূদী [রহ], সাইয়েদ কুতুব প্রমুখের অহেতুক সমালোচনায় শরীক হতে অনেকেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের উৎসের সাথে যাচাই করে যথার্থ সমালোচনা করার

www.bjilibrary.com

যোগ্যতা অর্জনের কেউই প্রয়োজন মনে করে না। বস্তুত জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান পেতে মুসলিমদের কুরআন ও সুন্নাহ চর্চা করতে হবে।...

পশ্চিমাদের খুশি করার জন্য নয় বরং নিজেদের সহিষ্ণুতা, দয়ার্দ্রতা, মহানুভবতা ও এহেন যাবতীয় ইসলামী সৌন্দর্য ও সুরভী বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষেপণাস্ত্রের জোর বাড়াতে হবে।

মহান আল্লাহ বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ উম্মাতের মর্যাদায় থাকার উদ্যোগ নিয়ে মধ্যযুগীয় বিশাল সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে মুসলিমরা যতটা অগ্রগামী হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর গোলামী যুগে হীনমন্যতার শিকার হয়ে তারা ততোধিক পিছিয়ে পড়েছে। তাদের হারানো শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করতেই হবে।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশার-রফ হোসেন খান।

হান্টিংটন ডকট্রিন : একটি পর্যালোচনা

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজতন্ত্র যেমন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি পশ্চিমা তাদের নতুন শত্রু বা প্রতিপক্ষের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে ওঠে। এই সময়ে তারা তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে ইসলামকে টার্গেট করে। সেই থেকে তারা ইসলামের তাদের যাবতীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে তারা নানা ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য তাদের এই অপপ্রচারের দরোজা খুলে দেন হান্টিংটন তাঁর গ্রন্থে। তাঁর এই গ্রন্থটি পশ্চিমাবিশ্বের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের এখন সচেতন হবার সময় এসেছে। আমাদের বুঝতে হবে যে, পশ্চিমারা নানা কৌশলে আমাদেরকে তাদের ঘরে প্রবেশে বাধ্য করছে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাদেরকে আমাদের ঘরে প্রবেশ করানো সম্ভব হবে না। কারণ তারা জাতিগতভাবে সচেতন ও সতর্ক। নিজেদের কালচার তারা যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন আঁকড়ে থাকতে বদ্ধপরিকর। দুঃখের বিষয়, আমরা তেমন সতর্ক নই। তবে আমাদের মানসিক পরাজয় থেকে মুক্তি পেতে হবে। তাহলে পশ্চিমা-গোলামী থেকেও আমরা মুক্ত হতে পারবো।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত "হান্টিংটন ডকট্রিন : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "হান্টিংটন ডকট্রিন : একটি পর্যালোচনা"– শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও দৈনিক সংগ্রামের সহকারী সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব

www.bjilibrary.com

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, এহসান যুবাইর, ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম, আহসান হাবীব ইমরোজ, শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, মাহবুবুল হক, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তওহীদ হুসাইন প্রমুখ।

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। এটা চলতে থাকবে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত। হান্টিং তাঁর গ্রন্থে মূলত জাহিলিয়াতকে মদদ দিয়েছেন। তাঁর জন্য সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে তেমন কলমযোদ্ধার অনেক অভাব রয়ে গেছে যারা তাঁদের কলমের শাণিত শক্তি দিয়ে মুসলিম মিল্লাতী জাগিয়ে তুলতে পারেন। এই শূন্যতা পূরণ করতে পারলে ইসলামের হৃত-গৌরব বিশ্বের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হত। পিছিয়ে পড়া মুমিন-মুসলমানের কাজ নয়। আমাদেরকেও সার্বিক ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং তার প্রমাণ পেশ করতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান বলেন, হান্টিংটন তাঁর গ্রন্থে সভ্যতার বিভাজনকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এটাই তাঁর গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের এখন মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে ভাবতে হবে। পশ্চিমাবিশ্বের মুকাবিলা করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এর জন্য আমাদের একদিকে লেখনী শক্তি, অপরদিকে মিডিয়া শক্তিতে বলীয়ান হওয়া প্রয়োজন। আজ ইহুদী এবং খ্রীস্টান সব এক হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। সুতরাং তাদের মুকাবিলা করার মতো যথাযথ কৌশল ও শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, হান্টিংটনের গ্রন্থে পাশ্চাত্যের খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য অর্থই সাম্রাজ্যবাদ। আর সাম্রাজ্যবাদ মানেই আগ্রাসন। এটা আমাদের বুঝতে হবে। একমাত্র ইসলাম ছাড়া আমাদের আর কোনো সহযোগী বা আশ্রয় নেই। এখন প্রয়োজন মুসলিম দেশগুলোর আন্তঃসম্পর্কে বৃদ্ধি করা। আমরা যদি মানবতার জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি তাহলে দেখা যাবে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে। এখন আমাদের সচেতন হওয়া এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করার সময়।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, আলো এবং অন্ধকারের দ্বন্দ্ব অবধারিত সত্য। সুতরাং রাসূলের (সা) পথ অনুসরণ করে আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে, প্রত্যেকের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের এখন

www.bjilibrary.com

প্রয়োজন শক্তিশালী মিডিয়ার, যার মাধ্যমে অন্তত অমারা আমাদের কথাগুলো বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারি।

ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির বলেন, প্রতিটি দেশেই হান্টিংটন আছেন। তাদেরকে মুকাবিলা করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করাই আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত।

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম বলেন, হান্টিংটন পশ্চিমাবিশ্বের জন্য জ্যোতিষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের উচিত, আমাদের চোখ দিয়ে ইসলামকে দেখা। সুতরাং ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া আমাদের মুক্তির আর কোনো পথ নেই।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, হান্টিংটন গোটা বিশ্বকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। তিনি সকল সময় প্রতিপক্ষ খোঁজেন। এখন তাঁর প্রতিপক্ষ পশ্চিমাবিশ্বের মতো সেই ইসলাম এবং মুসলিমবিশ্ব। তাদের একটাই লক্ষ্য যে, কিভাবে ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করা যায়। সুতরাং আমাদের এখনই অত্যন্ত সতর্ক ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

জনাব এহসান যুবাইর বলেন, হান্টিংটনের বড় কৃতিত্ব যে, তিনি আমেরিকার একটি শত্রু উপহার দিয়েছেন যার নাম– ইসলাম। বস্তুবাদী সভ্যতার সাথে ইসলামী সভ্যতার দ্বন্দ্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু আমরা সেই ব্যাপারেও খুব একটা সতর্ক নই। আমরা পশ্চিমাবিশ্বকে চিনতে ও বুঝতে ভুল করছি। যার খেসারত আমাদের দিতে হচ্ছে।

মূল প্রবন্ধে জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, "স্যামুয়েল হান্টিংটন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, জন এম আলন ইনস্টিটিউট ফর স্ট্যাটিজিক স্টাডিজ এর পরিচালক এবং হার্ভার্ড একাডেমী ফর ইন্টারন্যাশনাল এন্ড এরিয়া স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান। তিনি কার্টার প্রশাসনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিকিউরিটি প্ল্যানিং এর পরিচালক এবং ফরেন পলিসি জার্নাল-এর কো এডিটর এবং আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তার মতো বড় মাপের একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞের লেখনী থেকে সভ্যতা সংঘাতের এই ডকট্রিন বেরিয়ে আসার পর বিশ্বব্যাপী নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেউ কেউ তাকে অভিনন্দন জানিয় বলেছেন যে, ইতিহাসের অমোঘ পরিণতির কথাই তিনি দুনিয়াবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অনেকের মতে, ইসলামী সভ্যতার এক শ্রেণীর অনুসারী মৌলবাদের প্রসার এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানব জাতিকে শৃঙ্খলিত করার যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সভ্যতা তার মুকাবিলার সাম্প্রতিক বছরসমূহের যে সামরিক পদক্ষেপ নিচ্ছে তাকে হান্টিংটনের এই মতবাদ বিপুলভাবে উৎসাহিত করবে এবং তিনি ইতিহাসের যথার্থ বিশ্লেষণ করেই Clash of Civilization theory উদ্ভাবন করছেন। তবে তার সমালোচকরাও কম যাননি, তাঁরা তার চিহ্নিত সভ্যতাগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা

www.bjilibrary.com

বলেছেন তাঁর দেখা সভ্যতার সংঘাত বস্তুত বায়বীয়। কম্যুনিজমের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী এখন নেই। কম্যুনিজমকে পরাভূত করার জন্য তারা মুসলিম বিশ্বকে কাজে লাগিয়েছে।...

বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেছেন যে, হান্টিংটনের বই পড়ে মনে হয় যে সংঘাত সংঘর্ষ ছাড়া সভ্যতার আর কোনও কাজ নেই। তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হবে, মারামারি করবে এবং এভাবে প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়ায় দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা প্রকৃতভাবে সভ্য সমাজের কাজ নয় বরং বর্বর সমাজের কাজ। হান্টিংটন এই বর্বরতাকেই সভ্যতা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চিহ্নিত সভ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। খৃস্ট ধর্মের প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে নিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা। এই দুই সম্প্রদায়ের অবস্থান এবং পশ্চিমা ইউরোপের জার্মান ও রোমান সংস্কৃতির ব্যবধানও তাঁর থিওরীতে আসেনি। একইভাবে চীনের মিত্র হিসেবে ভিয়েতনামকে প্রদর্শন পাহারা দেয়ার জন্য ভিয়েতনাম বিশাল বহরের একটি সেনাবাহিনী পোষণ করছে। তার হিসাবে তিনি বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত মুসলিম সমাজের বাস্তবতাকেও স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে হান্টিংটনকে আমি আদিম বৃত্তিতে বিশ্বাসী একজন পণ্ডিত [Primordialist] বলে মনে করি। আদিম যুগে বিভিন্ন গোত্র, উপজাতি এবং পাড়ায় পাড়ায় কলহ বিবাদ হতো। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের এই যুগে তিনি ঐ কলহকে সভ্যতার কলহে পরিণত করে মানব জাতিকে অসভ্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছে।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশারফ হোসেন খান।

দুর্নীতি : এর নানা রূপ, কারণ ও প্রতিকার

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, দুর্নীতিতে গোটা বিশ্ব এখন ছেয়ে গেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে এর কুপ্রভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। এখন আমাদের সময়ের প্রয়োজনের দিকে তাকাতে হবে। দুর্নীতির কারণগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্নীতির উৎসমূল বিনষ্ট করতে না পারলে এই জাতির কোনো মুক্তি নেই।

গত ১লা নভেম্বর, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "দুর্নীতি : এর নানা রূপ কারণ ও প্রতিকার" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান,

www.bjilibrary.com

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, ড. এম এ সামাদ, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বুলবুল, এহসান যুবাইর প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এব মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, দুর্নীতির করালগ্রাসে বাংলাদেশ আজ সয়লাব। একটি দেশ ও সমাজকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে চাই একদল সত্যনিষ্ঠ আল্লাহভীরু মানুষ। তাঁরা যদি সকল স্তরের মানুষের মধ্যে তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও সততার দৃষ্টান্ত যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাহলে সমাজ ও দেশ দুর্নীতি মুক্ত হওয়া সম্ভব। সেই ধরনের একদল নিবেদিতপ্রাণ মানুষের আজ বড় বেশি প্রয়োজন।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, রাসূল [সা] তাঁর গোটা জীবনে বাস্তবতার নিরীখে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে কিভাবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আজ রাসূলের [সা] কর্মপদ্ধতিকেই আমাদের মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

ড. এম এ সামাদ বলেন, নীতির সাথে যখন পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তখনই সংঘটিত হয় দুর্নীতি। মানব জীবনের জন্য দুর্নীতি একটি ভয়াবহ ক্ষত। নীতি না থাকার কারণে বিশ্বে এখন এত বিপর্যয় ঘটছে। নীতি ও আদর্শের অনুসরণ ছাড়া দুর্নীতিমুক্ত সমাজের আশা করা যায় না। তাই সমাজের স্থিতি, সুখ-সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণের জন্যই আজ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আমাদের একান্ত কাম্য। এজন্য প্রয়োজন আল্লাহর দেয়া বিধান এবং রাসূলের [সা] পথ যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান বলেন, দুর্নীতি এখন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। এ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এখনই আমাদের করণীয় পন্থা অবলম্বন করা জরুরি।

ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান বলেন, দুর্নীতি থেকে মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম। ইসলাম ছাড়া আর কোনো মাধ্যমেই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আশা করা যায় না। তাকওয়াভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকলে নীতি-নৈতিকতার প্রশিক্ষণও জারি থাকতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেটা নেই। তবুও আমরা যদি আন্তরিকভাবে ইসলামের আলোকে সমাজকে আলোকিত করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম বলেন, রাসূলকে [সা] পাঠানোই হয়েছে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। আমরা যদি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে পারি তাহলে দুর্নীতিও দূর হবে।

www.bjilibrary.com

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, নীতির বাইরে যা ঘটে, তাই দুর্নীতি। আজ অনিয়মটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে– এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। দুর্নীতির বহুবিধ কারণ রয়েছে। কারণ আখিরাতের জবাবদিহিতার ব্যাপারে উদাসীনতা, লোভ-লালসা, অতিরিক্ত ভোগের তৃষ্ণা, বিলাসিতা ও বস্তুগত বিষয়ে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। এই সকল হীন মানসিকতা থেকে দূর থাকতে পারলে দুর্নীতি সংঘটিত হত না। ন্যায়-অন্যায় বোধের অভাবে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। আমরা যদি মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল আল কুরআন এবং আস্‌সুন্নাহ। মানুষকে সেইদিকেই আহ্বান জানাতে হবে। আল্লাহর দরবারে মানুষের জবাবদিহিতার ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। তাহলেই সমাজ দুর্নীতিমুক্ত হবে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, দুর্নীতির দরোজা খুলে রাখলে সমাজ থেকে কখনই দুর্নীতি দূর হবে না। সুতরাং দুর্নীতির দরোজা-জানালাগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

জনাব এহসান যুবাইর বলেন, অনেক সময় অভাবের কারণেও মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ে। যদি মানুষের জীবনমান উন্নত করা যায়, যদি তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে খেয়াল রাখা হয়– তাহলে সমাজ থেকে দুর্নীতি অনেকাংশেই দূর হয়ে যাবে। দুর্নীতি এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এটাকে দুর্নীতিবাজরা আজ আর অন্যায় বলে গণ্য করে না। একমাত্র আখিরাতের চিন্তা ও ভীতিই মানুষকে সত্যপথে চালিত করতে পারে।

ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানুষ দুর্নীতি করে থাকে। যদি তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা যায় তাহলে আমরা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ পেতে পারি।

মূল প্রবন্ধে জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন,

"যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশদাতা শয়তান। 'আর নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' [সূরা : ১২ ইউসুফ : ৫নং আয়াত]। আল্লাহপাক বলেছেন, 'হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' [সূরা : ২ আল বাকারা : ১৬৮ নং আয়াত]। আল্লাহপাক আরো বলছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'। [সূরা : ২ আল বাকারা : ২০৮ নং আয়াত]

যেহেতু দুর্নীতি একটি মহাপাপ এবং শয়তান কর্তৃক নির্দেশিত মন্দ কাজ সুতরাং তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাজ্য। বস্তুত স্বেচ্ছায় দুর্নীতি পরিত্যাগ করাই যুক্তি, বিবেক এবং ঈমানের দাবি। এরপরও কেউ যদি স্বেচ্ছায় দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে তার ওপর আরোপিত শাস্তি ন্যায় সংগতই হয়। কিন্তু উদ্ধৃত

www.bjilibrary.com

আয়াতগুলোর মর্ম বিবেচনা এবং জাতীয়ভাবে আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে জন্ম দেয়। আমরা কি শয়তানকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করি? মানুষ যখন শয়তানের পদাংক বা শয়তানের নির্দেশ অনুসরণ করতে শুরু করে, মানুষের পাপ শুরু হয় সেখান থেকেই। আমরা কি শয়তানের প্ররোচনায় মানুষের উদ্বুদ্ধ না হওয়ার মত পরিবেশ দিতে পেরেছি? আসমান থেকে পাঠানো বাণী– 'যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশদাতা শয়তান'– আমরা কি বিশ্বাস করি? আমাদের জাতীয় জীবনে এই প্রশ্নগুলোর জবাব ইতিবাচক নয়। বর্ণিত বিশ্বাসের প্রতিফলন আমাদের জাতীয় জীবনে নেই বললেই চলে। শয়তানকে শত্রু বিবেচনায় যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কোন জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা আমাদের নেই। ফলে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে যুগ যুগ ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোন সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। শয়তানকে শত্রু বিবেচনায় যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত ও সংগ্রাম সফল হবার নয়।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী উপস্থিতি ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

পুঁজিবাদী শোষণের নানা কৌশল

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেন, বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদ একটা বড় ধরনের সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। সমস্যা যেহেতু আছে, সেই কারণে তার সমাধানও আছে। পুঁজিবাদী শোষণের বিষয়টি অত্যন্ত মারাত্মক। এটা একটা চলমান ইস্যুও বটে। পুঁজিবাদের আধুনিক কৌশলগুলো আমাদের সামনে রাখতে হবে এবং তার মুকাবিলায় শোষণহীন অর্থব্যবস্থার কৌশলগুলো বাস্তবতার আলোকে প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমান রাজনৈতিক, বহুজাতিক কোম্পানী এবং এনজিওর মাধ্যমে শোষণ-পীড়ন চালানো হচ্ছে। শোষণ করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের সাংস্কৃতিক শোষণের কৌশলও ভাবতে হবে এবং এর সমাধান বের করতে হবে।

গত ২৯শে নভেম্বর, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনার "পুঁজিবাদী শোষণের নানা কৌশল" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক এবং ব্যাংকার জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. এম উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ কোরবান আলী, ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, মোহাম্মদ শেখ শোয়েব নাজির, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ড. এম এ সামাদ, ড. মাহফুজ পারভেজ, এহসান যুবাইর প্রমুখ।

www.bjilibrary.com

উক্ত সেমিনার প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, পুঁজিবাদ শোষণের একটি মোক্ষম কৌশল। শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে একবার ড. আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন : "হে আল্লাহ! এই কওম যে বিপদগ্রস্ত সেটা বুঝার তওফীক তাদেরকে দাও।" পুঁজিবাদের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সচেতনতার। প্রয়োজন জাগৃতির। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আমরা যদি ইসলামের শোষণমুক্ত সমাজের মডেল উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে মানুষ শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পাবে। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামের গণভিত্তি তৈরি করা। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বিশ্বের যে প্রান্তে যখনই ইসলাম কিছুটা শক্তি অর্জন করেছে, তখনই পাশ্চাত্য সেখানে আঘাত হেনেছে। তবুও আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ ইসলাম ছাড়া দুনিয়ায় কখনও কল্যাণ সাধিত হয়নি, আগামীতেও হবে না। মানুষের জ্ঞান ও চোখের স্বচ্ছতা তৈরি করতে পারলে, তাদেরকে পাশ্চাত্যের সকলপ্রকার আগ্রাসন থেকে আমরা মুক্তি পাবো। আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি। সাহায্য এবং বিজয় তো কেবল আল্লাহরই হাতে।

ড. এম. উমার আলী বলেন, পুঁজিবাদ এখন দেশের গ্রামগুলোকেও গ্রাস করেছে। সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে তারা শোষণের প্রকৃতস্বরূপ যেমন বুঝে উঠতে পারে না, তেমনি ইসলাম সম্পর্কেও সঠিকভাবে ধারণা লাভ করতে পারে না। পুঁজিবাদ আমাদের স্বকীয়তা, জাতীয়তা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস করে দিচ্ছে। জাতিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হলে এই অভিশাপ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি।

ড. মুহাম্মাদ কোরবান আলী বলেন, পুঁজিবাদের শোষণের কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু এর সমাধান কোন্ পথে সেই বিষয়ে অবগত খুব কম সংখ্যক মানুষ। সুতরাং ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে শোষণের সমাধানগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। পুঁজিবাদের শোষণ থেকে এই জাতি কিভাবে মুক্তি লাভ করতে পারে, এই বিষয়ে আজ যথাযথ ভূমিকা রাখা জরুরি। শুধু তাত্ত্বিক দিকে নয়, প্রায়োগিক কৌশলগুলোও সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে হবে। তাহলেই আমরা এই শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো।

ড. এম এ সামাদ বলেন, বিশ্বমানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো পুঁজিবাদ। ব্যক্তির স্বার্থই এখানে মুখ্য এবং মানব জাতির কল্যাণ গৌণ। পুঁজিবাদ চালানোর প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য পাশ্চাত্য যে কোনো জাতিকেই ধ্বংস করে দিতে প্রস্তুত। তারা এ ব্যাপারে এতই হিংস্র যে, তাদেরকে মুকাবিলা করার সামর্থ্য আজও কোন দেশ অর্জন করতে পারেনি। পুঁজিবাদী শোষণের মাধ্যমে তারা মূলত ইসলামকেই ধ্বংস করতে চায়। অতএব আমাদের সতর্ক এবং সচেতন হবার সময় এসেছে। ইসলামের শোষণমুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ

www.bjilibrary.com

অর্থনীতি যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে আমরা পুঁজিবাদের শোষণ থেকে ইনশাআল্লাহ মুক্তি পাবো।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা বা তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ জীবন ব্যবস্থার সাথে ইসলামের পার্থক্যগুলো খুবই সুস্পষ্ট। যেমন : অথরিটির কথাই ধরা যাক। ইসলামে অথরিটি স্বয়ং আল্লাহপাক। মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রাখছেন। এমনকি মনের খবরও। সকল মানুষই তাঁর কাছে একাউন্টিবিলিটি। মেধা, বংশ বা বর্ণের কারণে কোন মানুষের আলাদা কোন স্টাটাস তাঁর কাছে নেই। মনের খবরসহ প্রতিটি মানুষের এই খোঁজখবর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় Technical Support এবং Managerial Tools তাঁর রয়েছে এবং এ বিষয়ে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অথরিটি হচ্ছে কিছু মেধাবী বা প্রভাবশালী ধনী মানুষ। যারা নিজেদেরকে অথরিটি রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখতে যাবতীয় সূক্ষ্ম ও স্থূল তথা 'মাইক্রো' ও ম্যাক্রো পদ্ধতিতে শোষণের আশ্রয় নিচ্ছে। সুদ তেমনি একটি মাইক্রো শোষণ পদ্ধতি। আর পারমাণবিক আস্ত্রের বিপুল সম্ভার হচ্ছে শোষণের একটি Macro tools বা স্থূল হাতিয়ার। সহজ করে বললে বলতে হয় মুণ্ডর দেখিয়ে সুদের জীবনঘাতি শোষণই হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক পরিচয়। এ ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার আপন-পর বলে কোন ভেদাভেদ নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মেধা, বংশ, বর্ণ এবং ধনীর স্টাটাস নিশ্চিত করা সাপেক্ষে অথরিটি টিকে থাকে। এছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোন অস্তিত্বই থাকে না। শোষণই এর লাইফ সাপোর্ট। শোষণ ব্যতীত এক মুহূর্তও এ জীবন ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। এ ব্যবস্থার যাবতীয় গবেষণা হচ্ছে শোষণের diversification কে কেন্দ্র করে। আর বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী শোষণের diversified সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে : ১. মাইক্রোক্রেডিট গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত অভিনব ব্যবস্থার একজন ভিখারীকেও অর্থনৈতিক শোষণ। ২. সৌন্দর্যের পূজা, ফ্যাশন শো আর মহিলাদের ক্ষমতায়নের নামে দেশী-পরদেশী নির্বিশেষে নারীর আব্রু শোষণ। ৩. গ্লোবালাইজেশনের অথবা New World Order অথবা সন্ত্রাস দমনের নামে সামরিক আগ্রাসন এবং রাজনৈতিক শোষণ।

একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজনৈতিক শোষণ ও সামরিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং মানব জাতির সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক নারী জাতির আব্রু শোষণই মূলত গোটা বিশ্বে মনোমুখী শোষণের সয়লাব ঘটিয়েছে। জীবনের ভার বহন এক দুর্বিষহ অভিশাপের মত করে তুলেছে। বিশ্বের সাধারণ জনগণের জীবনকে পুঁজিবাদী অথরিটির এ এক অনিবার্য ফল। এই সর্বব্যাপী শোষণের বন্যার সয়লাব থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করতে ইসলামের মানবিক জীবন ব্যবস্থার সত্যিই কোন বিকল্প নেই। শুধু যাকাতের পদ্ধতি যাবতীয় অর্থনৈতিক শোষণকে মিটিয়ে দিতে যথেষ্ট হলেও, শুধু আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিজাবের পদ্ধতি

www.bjilibrary.com

অনুসরণ আক্রর শোষণকে মিটিয়ে দিতে যথেষ্ট হলেও, ইসলামের প্রতি আন্তরিক Commitment রাজনৈতিক শোষণকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট হলেও দুঃখজনকভাবে মুসলিম বিশ্ব ব্যক্তিগত লোভ-লালসা চরিতার্থে নিবেদিত হয়ে নিজেরাই পুঁজিবাদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়ে আছে। শোষণের যাতাকল থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করতে যাবতীয় অযোগ্যতার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের চেতনায় ঘুরে দাঁড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, পুঁজিবাদের দুষ্টক্ষতে সমগ্র পৃথিবী আক্রান্ত। পুঁজিবাদকে সম্প্রসারিত করার জন্য যা যা করার প্রয়োজন, পাশ্চাত্য তার কোনোটাই বাদ রাখছে না। ইসলামী অর্থনীতি চালু থাকলে পুঁজিবাদ এইভাবে জেঁকে বসতে পারতো না। পুঁজিবাদের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে ইসলামের কাছেই ফিরে আসতে হবে। ইসলামের অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পুঁজিবাদের ভয়াল গ্রাস থেকে মুক্তির উপায় এবং বাস্তবসম্মত কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, পতিতাবৃত্তি, মজুদদারী, ক্ষুদ্র ঋণ, মাদকদ্রব্য, এনজিও কার্যক্রম প্রভৃতি পুঁজিবাদের শোষণের কৌশল। পুঁজিবাদী শোষণের চিত্র অত্যন্ত মারাত্মক। এর ভয়াবহ দিকগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। আমরা যদি জনগণকে হালাল-হারাম মেনে চলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, যদি যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করতে পারি– তাহলে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির একটা পথ খুঁজে পাবো।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, পুঁজিবাদের অর্গানিক দিকগুলো আরও বেশি করে চিহ্নিত করা জরুরি। পুঁজিবাদের শোষণ নানাভাবে চলছে। এর মধ্যে সামরিক কৌশলও অন্যতম। পাশ্চাত্যের মূল ব্যবসা হলো ফিল্ম, অস্ত্র, মাদকদ্রব্য প্রভৃতি। তারা সাংস্কৃতিক শোষণও চালিয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য এখন সর্বগ্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমেরিকা মানবিক সাহায্যের ছলে যে কোনো দেশে একবার প্রবেশ করলে সেখান থেকে তারা আর বেরিয়ে আসে না। সেখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসে যায় স্থায়ীভাবে। তাদের অপকৌশল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে হবে। তাদেরকে বুঝাতে হবে নব্য সাম্রাজ্যবাদের ভয়ালো চিত্র। তাদেরকে মুকাবিলা করতে পারে একমাত্র ইসলাম। সুতরাং ইসলামী সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

জনাব এহসান যুবাইর বলেন, ভোগবাদের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণেই পুঁজিবাদ এমনভাবে আমাদেরকে গ্রাস করেছে। পুঁজিবাদের কুফল আমরা ভোগ করছি প্রতিনিয়ত। কিন্তু সে ব্যাপারে আমরা আদৌ সচেতন নই। পুঁজিবাদের এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে আসার পথ ও কৌশল আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।

মূল প্রবন্ধে জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম উল্লেখ করেন, "সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দ্যোতক নয়। ১৭৭৫ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে

www.bjilibrary.com

ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নিজেদেরকেও মুক্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু দেড়শো বছরের বেশি সময় রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও একই রকম। যতদিন ল্যাটিন আমেরিকা বা মধ্যপ্রাচ্য খনিজ তেল ও কাঁচামালে সমৃদ্ধ থাকবে ততদিন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে না। নব্য সাম্রাজ্যবাদ বা নব্য উপনিবেশবাদ যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে শোষণের নিত্য-নতুন কৌশল বের করবে। এছাড়াও পুঁজিবাদের মধ্যেই এর সংকটের কারণ নিহত আছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত রকম কলাকৌশলের দ্বারস্থ হোক না কেন সংকট থেকেই যাবে। তাই বলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসক ও শোষক গোষ্ঠী শোষণের কলকৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগে কখনই শৈথল্যকে প্রশয় দেবে না। মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভক্তির মাধ্যমে মানবিক সংহতি নষ্ট করে জনে জনে প্রতিহিংসামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং তার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির মুনাফা কামানোই তাদের শোষণ কৌশলের অংশ। যুদ্ধবাজ মুনাফা কামাতে ব্যর্থ হলে, যুদ্ধাবস্থা মুনাফা কামাবে। পুঁজিবাদী নব্য সাম্রাজ্যবাদের নব নব কৌশলের কাছে যেন বিশ্ববাসী জিম্মি হয়ে গেছে। মন্দা ও বিশ্বব্যাপী সামাজিক ঘৃণা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পুঁজিবাদীরা শেষ পর্যন্ত খৃস্ট সাম্রাজ্যবাদকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ধাক্কা দেয়ার সময় হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সংকট কাটাতে যে যুদ্ধ পরিকল্পনা পুঁজিবাদীরা কৌশল হিসেবে নিয়েছে সেটি মানবিক ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিহত করা এবং অমানবিক জঙ্গীভাব পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিকপন্থায় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের মুনাফা সংগ্রহের কৌশলকে অকার্যকর করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নিয়ত বিস্তারকে রুদ্ধ করতে হবে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘণ্টা বেজে গেছে। তারা একঘরে হবেই। এখন প্রয়োজন সর্বাধিক বিভাজন পরিহার করে পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে মানবিক ও আদর্শগত ঐক্য গড়ে তোলা।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান। ■

লেখক-পরিচিতি : মোশাররফ হোসেন খান; কবি, সম্পাদক– মাসিক নতুন কলম।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা